পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৭ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা

২৪শে শওয়াল, ১৪১৬ হিঃ ॥ ১লা চৈত্র, ১৪০২ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই মার্চ, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ ঋণ শোধ করা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ৫

হাকিকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৬

জুমুআর খুৎবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১২

আহ্‌মদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাষান্তর : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৩

চলতি দুনিয়ার হালচাল ঃ বাঁধন হারা জীবনের ফসল

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ২৭

পত্র-পত্রিকা থেকে ২৯

এম, টি, এ ডাইজেস্ট

সংকলন—জনাব আবদুল্লাহ্‌ শামস্‌ বিন তারিক ৩০

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের আবির্ভাব

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩৫

ছোটদের পাতা

পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪৪

সংবাদ ৪৮

আসহাবে কাহাফের পাতা

আররকীম ৫১

সম্পাদকীয় ঃ ৫৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৭তম বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১৫ই মার্চ, ১৯৯৬ : ১৫ই আমান, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ১লা চৈত্র, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা-৪

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়-গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত (৫৭০) অংশ।

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ (৫৭১) উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত কথা বলিও (৫৭১-ক)।

১০। এবং তাহারা যেন (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং

৫৭০। এই আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। ইহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সামাজিক সম-মর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করিয়াছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্তির অধিকার রাখে। পরবর্তী আয়াতে উত্তরাধিকারের বিস্তারিত আইন-কানুন বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫৭১। 'অন্যান্য আত্মীয়, এতীম ও দরিদ্র' দ্বারা ঐ সব আত্মীয়, এতীম ও দরিদ্র বুঝাইয়াছে, যাহারা উত্তরাধিকারী না হওয়ায় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়ার দাবীদার হইতে পারে না। আয়াতটি মুসলমানগণকে এই বলিয়া উপদেশ ও উৎসাহ দিতেছে যে, সম্পত্তি-বন্টনের, 'উইল' করার সময়, সম্পত্তির একটা অংশ তাহাদের জন্যও যেন দিয়া যাওয়া হয়।

৫৭১-ক। 'লাহুম' অর্থ 'তাহাদের পক্ষে' হইতে পারে।

(এতীমদের সহিত) সঠিক (৫৭২) কথা বলে।

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। রুকু-১

১২। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক। এবং তাহার পিতামাতা (৫৭৩) উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা হইতে ষষ্ঠাংশ হইবে যাহা সে ছাড়িয়া গিয়াছে যদি তাহার সন্তান (৫৭৪) থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। তোমাদের পূর্বপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহা ফরয (৫৭৪-ক) করা হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৫৭২। এই আয়াত এতীমগণের সপক্ষে এক জোরালো ভাষায় আবেদন।

৫৭৩। পিতা ও মাতা উভয়েই (লেইন)।

৫৭৪। 'ওয়ালাদ' অর্থ (১) সন্তান, পুত্র, কন্যা, শিশু, (২) সন্তানাদি, পুত্র-কন্যাগণ। শব্দটি একবচন ও বহু বচন এবং পুং-স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

৫৭৪-ক। এই আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সকল নিকট আত্মীয়ের অংশ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে সকলেই যথাযোগ্য অংশ পাইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান, পিতামাতা, স্বামী বা স্ত্রী হইল মূল উত্তরাধিকারী, তাহারা থাকিলে সর্বাবস্থায়ই নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিবে। অন্যান্য আত্মীয় বিশেষ অবস্থায় অংশ পাইতে পারে। একজন পুরুষকে একজন স্ত্রীলোকের অংশের দ্বিগুণ দেওয়া হইয়াছে, এই কারণে যে, পুরুষকে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করিতে হয় (রূহুল মাআনী, ২য় অঃ, পৃঃ-৩২)। পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য অংশের অনুপাত নির্ধারণ করিয়া আয়াতটি বণ্টন-ব্যবস্থার কথা শুরু করিয়াছে। একজন পুত্র দুইজন কন্যার সমান পাইবে। যে ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা উভয়েই বিদ্যমান থাকিবে,

সেখানেই এই নিয়ম কার্যকরী হইবে। যেখানে কেবল কন্যা থাকিবে, পুত্র থাকিবে না, সেখানে কন্যাগণ সকলে মিলিয়া পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে, যদি তাহারা সংখ্যায় দুই-এর অধিক হয়। আর যদি একমাত্র সন্তান কন্যাই হয়, তাহা হইলে সে পাইবে সম্পত্তির অর্ধেকাংশ। যদি পুত্রহীন পিতার মাত্র দুইটি কন্যা সন্তান থাকে, তাহা হইলে দুই কন্যা মিলিয়া পিতৃসম্পত্তির কত অংশ পাইবে, তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। তবে বাক্যাংশটিতে (কিন্তু) অব্যয় 'ফা' ব্যবহার করা হইয়াছে যথা—কিন্তু যদি কন্যারাই কেবল (উত্তরাধিকারী) হয় এবং তাহারা দুই-এর অধিক হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় পূর্ববর্তী আয়াতের 'দুই কন্যার' উল্লেখের প্রতি 'ফা' (কিন্তু) অব্যয়ের সংযোগ রহিয়াছে, সেখানে দুই কন্যার অংশ নির্ধারিত হইয়াছে। তাহাছাড়া দুই কন্যার অংশ আমরা এই আয়াতের প্রথমে পাইয়া যাই, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অংশের অনুপাত নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে কন্যা দুইজন মিলিয়া একপুত্রের সমান। অতএব, যদি কোন ক্ষেত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা থাকে, তাহা হইলে পুত্র দুই-তৃতীয়াশ পাইবে আর কন্যা এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু যেহেতু দুই কন্যা এক পুত্রের সমান পাইবে, অতএব এই ক্ষেত্রে দুই কন্যার অংশও হইবে দুই-তৃতীয়াংশ। দুই বা ততোধিক কন্যার জন্য অপুত্রক পিতার সম্পত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইয়াছে। শুধু মাত্র দুই কন্যা থাকাবস্থায়, তাহারা কত অংশ পাইবে, এই কথা না বলাই যদি কুরআনের উদ্দেশ্যে হইত, তাহা হইলে এই বাক্যাংশটি উক্ত প্রকারে ব্যক্ত না হইয়া বরং নিম্নরূপ হইত; "একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান"। পিতামাতার অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে, তিন অবস্থায়, তিনটি শর্তের অধীনে, তিন ধরনের অংশ হইতে পারে: (১) যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক সন্তান রাখিয়া যান, তাহা হইলে পিতামাতা জীবিত থাকিলে প্রত্যেকে পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ; (২) সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং স্ত্রী-স্বামী কেহ না থাকিলে, পিতা-মাতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবেন, সেই ক্ষেত্রে মাতা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাইবেন; (৩) তৃতীয় অবস্থা, একটি বিশেষ অবস্থা, যাহা দ্বিতীয় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। উপরোক্ত (২) এ এই মৃতের ভ্রাতা-ভগ্নীর উল্লেখ নাই। যদি মৃতের ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে, মৃতের মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবেন এবং পিতা পাইবেন পাঁচ-ষষ্ঠাংশ। পিতাকে এই ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বেশী দিবার কারণ হইল, মৃতের ভাই-ভগ্নীর লালন পালনের ভার তাহার পিতার উপরেই বর্তায়। এই ক্ষেত্রে, মৃতের ভাই-বোনের উত্তরাধিকার সূত্র কিছুই সরাসরি পাইতেছে না। পরবর্তী আয়াতেও উত্তরাধিকারের বিষয়ই রহিয়াছে।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ঋণ শোধ করা

কুরআন ঃ

والذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون (المعارج ايت ٣٣)

অর্থাৎ এবং যারা তাদের নিকট (গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে। (আল্ মাআরেয আয়াত—৩৩)

হাদীস ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم

অর্থাৎ—হযরত রসূল করীম (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করতে টাল বাহানা করা অন্যায়।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে শক্তভাবে নসীহত করতেন। অপর একটি হাদীসে আছে শহীদের ঋণ ব্যতিরেকে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর দ্বারা জানা যায় যে, একজন মুসলমানকে হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক) সম্পর্কে কতটুকু সচেতন ও পরিষ্কার থাকতে হয়। আরেকটি হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) এই দোয়াটি বেশী বেশী করতেন যে, হে আল্লাহ্ ঋণের বোঝা ও মানুষের ক্রোধ হতে রক্ষা করো। মানুষ তার জীবনে কখনও কখনও ঋণ নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে কিন্তু এই ঋণ যথা সময়ে আদায় করাই তার ভালো মানুষ হবার প্রমাণ। এক গরীব ব্যক্তি যার সাধ্য নেই যে, ঋণ যথা সময়ে পরিশোধ করে। এমন ব্যক্তির টালবাহানা যে, হয়ত খোদা কোন পথ খুলে দিবেন সহ্য করা যেতে পারে ও সময় দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সামর্থ্যবান ব্যক্তির টাল বাহানা যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। সে একদিকে ওয়াদা ভঙ্গকারী অপরদিকে অপরকে কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে মুমেনের চিহ্ন এই বর্ণিত হয়েছে যে, সে তার ওয়াদা রক্ষা করে। আর কাফেরদের জন্যে বলা হয়েছে যে, তারা ওয়াদা ভঙ্গকারী।

আমাদের সমাজে বহু-ঝগড়া বিবাদ মামলা মোকদ্দমা ঋণের কারণে হয়ে থাকে। ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এমন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদে পতিত হওয়া অধঃপতনের লক্ষণ বৈ কিছুই নয়। আমাদের জীবনে কুরআন ও রসূলের শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন ধ্বংস হতে রক্ষা পাবো অপরদিকে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি আহমদীর জীবন যেন কুরআনসম্মত ও হাদীসসম্মত হয়। এবং বিশেষভাবে ঋণের নেতিবাচক ভূমিকায় যেন কেউ অবতীর্ণ না হয়। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, মানুষ যেন জ্ঞাতসারে নিজেকে গোনার গহ্বরে ফেলে না দেয়, নচেৎ সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এবং জ্ঞাতসারে কুপথ ধরে অথবা কূপে পড়ে যায় অথবা বিষ খায় সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। এমন ব্যক্তি না দুনিয়ার দৃষ্টিতে এবং না খোদার দৃষ্টিতে রহমের পাত্র হতে পারে। এই জন্য ইহা খুবই জরুরী এবং অত্যাবশ্যক জরুরী, বিশেষ করে আমাদের জামা'তের জন্য (যাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা আদর্শরূপে বেছে নিয়েছেন, তিনি চান যেন তারা ভাবী প্রজন্মের জন্য আদর্শস্বরূপ হন) যেন তারা যথাসাধ্য মন্দ সাহচর্য এবং কুঅভ্যাসকে পরিহার করেন এবং নিজদিগকে পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য তদবীর অবলম্বন করা উচিত, এ ব্যাপারে আদৌ ত্রুটি করা উচিত নয়।

স্মরণ রেখো, তদবীরও বস্তুতঃ প্রচ্ছন্ন ইবাদত, ইহাকে সাধারণ বিষয় ভেবো না। এই পথেই সে পথ উন্মুক্ত হয় যা মন্দকর্ম হতে মুক্তি পাওয়ার পথ। যারা মন্দকর্ম হতে মুক্তি পাওয়ার পথ ও তদবীর অবলম্বন করে না, তারা আসলে মন্দকর্মে সম্মত হয়ে পড়ে, এভাবে তারা খোদাতা'লা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

(মলফুযাত ঃ ৪র্থ খণ্ড, ২০১ পৃঃ)

(১১ পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ কাল বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সময় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি এই যে, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেন সে আকাশে উঠিয়া গিয়াছে অথবা মাটির মধ্যে লুকাইয়া গিয়াছে। যদি হত্যাকারী ধরা পড়িত এবং তাহার ফাঁসি হইত তবে ভবিষ্যদ্বাণীর এই সার্থকতা থাকিত না। বরং ঐ সময়ে সকলে বলিতে পারিত যে, যেভাবে লেখরাম মারা গিয়াছে সেভাবে হত্যাকারীও মারা গিয়াছে। কিন্তু হত্যাকারী এইভাবে হারাইয়া গেল যে, বুঝা যায় না সে কি মানুষ ছিল, না কি ফেরেশতা ছিল, যে আকাশে উঠিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

হাকিকাতুল ওহী

মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক: নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৫ ও ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আমার আত্মাকে কেহ অস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনে নাই (অর্থাৎ আমার আত্মার কেহ স্রষ্টা নাই, বরং ইহা আদি হইতে নিজে নিজেই আছে), বরং সদা সর্বদা পরমাত্মার আদি ক্ষমতার মধ্যে আছে এবং থাকিবে। * অনুরূপভাবে আমার দৈহিক উপাদান অর্থাৎ প্রকৃতি বা পরমাণু ও আদি পরমাত্মার ক্ষমতার কব্জায় মওজুদ আছে এবং কখনো বিলীন হইবে না এবং সমগ্র জগতের সৃজনকর্তা একজনই, অন্য কেহ নহে, তথাপি আমি পরমেশ্বরের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর মালিক বা স্রষ্টা নহি, না আমি সর্বব্যাপী, এবং না আমি অন্তর্যামী, বরং আমি এই মহা শক্তিমানের এক নগণ্য সেবক। কিন্তু আমি তাঁহার জ্ঞানে ও শক্তিতে আদি হইতে আছি, কখনো বিলীন হই নাই, না কোথাও কোন বিলীনতার স্থান আছে।

---

* টীকাঃ—ইহা কীরূপ বাজে কথা যে, পরমাত্মা সর্বদা আদি ক্ষমতায় ছিল এবং থাকিবে। বলা বাহুল্য, আর্য সমাজীদের কথা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে আত্মাসমূহ তাহাদের সকল শক্তি ও কুদরতসহ আদি হইতে নিজে নিজেই আছে, সেক্ষেত্রে পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের কীইবা সম্পর্ক আছে। এই সকল শক্তিকে পরমেশ্বর না বাড়াইতে পারে, না কামাইতে পারে, না কোন প্রকারে ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আর্যদের কথা অনুযায়ী ঐ সকল আত্মা নিজ নিজ সত্তায় নিজেই পরমেশ্বর। তাহাদের উপর পরমেশ্বরের এক কণাও এহসান বা অনুগ্রহ নাই। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মাসমূহ পরমাত্মার আদি ক্ষমতায় আছে এবং থাকিবে—লেখরাম ও তাহার অন্যান্য স্বধর্মীদের এই কথা কেবল নিজেদের ভ্রান্ত ধর্মকে ঢাকিয়া রাখার জন্য বলা হইয়া থাকে। কেননা, মানুষের বিবেক ইহাকে সর্বদা বেহুদা বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যদি খোদা আত্মাসমূহের ও তাহাদের শক্তিসমূহের এবং পৃথিবীর অণু-পরমাণুসমূহের ও উহাদের শক্তিসমূহের স্রষ্টা না হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহাদের খোদাই হইতে পারেন না। এই কথা বলা যে, যদিও আমরা আত্মাসমূহকে তাহাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খোদার বান্দা ও তাঁহার সৃষ্টি বলিতে পারি না, কারণ, তিনি তাহাদিগকে তৈরী করেন নাই, কিন্তু যখন পরমেশ্বর আত্মাসমূহকে দেহে স্থাপন করেন তখন তাঁহার এইটুকু কাজের জন্য তিনি তাহাদের পরমেশ্বর

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

বরং কোন বস্তুই বিলীন হয় না। অনুরূপভাবে বেদের এই ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাকেও আমি স্বীকার করি যে, মুক্তি অর্থাৎ নাজাত কর্মানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লাভ করা যায় (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নাজাত নাই বরং হইা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকে)। ইহার পর পরমাত্মার ন্যায়-নীতি অনুযায়ী মানুষকে দেহ ধারণ করিতে হয়। সীমাবদ্ধ কর্মের জন্য সীমাহীন ফল নাই (কর্ম তো সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বস্ত উপাসকের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নহে। তাহাছাড়া কর্মের সীমাবদ্ধতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী নহে)। আমি বেদের এই সকল শিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি ও মানি.....এবং আমি ইহাও মানি যে, পরমেশ্বর পাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেন না (অদ্ভুত পরমেশ্বর?)। আমি কোন শাফায়াত বা সুপারিশের উপর ভরসা করি না (অর্থাৎ কাহারো পক্ষে কাহারো দোয়া কবুল হয় না)। আমি খোদাকে রাশি অর্থাৎ ঘুষখোর বা যালেম মনে করি না (শব্দটি

টীকার অবশিষ্টাংশ:

হইয়া যান। এই ধারণাও ভ্রান্ত। কেননা, যে পরমেশ্বর আত্মাসমূহকে এবং পরমাণুসমূহকে তাহাদের সকল শক্তিসহ সৃষ্টি করেন নাই, সেক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না যে, তাহাদিগকে জোড়া লাগাইবার ব্যাপারে তিনি শক্তিমান। কেবল কোনটির সহিত কোনটির জোড়া লাগাইলেই তাঁহার উপর পরমেশ্বর হওয়ার অধিকার বর্তায় না। বরং এইরূপ অবস্থায় তিনি ঐ রুটি প্রস্তুতকারীর ন্যায় হইয়া থাকেন, যে বাজার হইতে আটা আনিল, কোন লাকড়ী বিক্রেতার নিকট হইতে লাকড়ী আনিল, প্রতিবেশীর নিকট হইতে আগুন আনিল, অতাপর রুটি পাক করিল। এমতাবস্থায় পরমেশ্বরের সত্তার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। কেননা, যদি আত্মাসমূহ তাহাদের সকল শক্তিসহ আদি হইতে নিজে নিজেই থাকিয়া থাকে-তবে এই কথার কি প্রমাণ আছে যে, আত্মাসমূহের ও পরমাণুসমূহের যোগ বিয়োগও আদি হইতে নিজে নিজেই নাই? নাস্তিকদের ধারণাও এইরূপ। এইজন্য আর্য সমাজীরা তাহাদের পরমেশ্বরের সত্তা সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পারে না, না তাহাদের নিকট কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে। ইহাই হইল বেদের জ্ঞানের সার কথা, যাহার উপর গর্ব করা হইয়া থাকে। ইহা সকলের জানা আছে যে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ এই অবস্থায় দলিল প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যখন তাঁহার সত্তাকে সকল কল্যাণের উৎসরূপে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহাকে সকল অস্তিত্বের স্রষ্টারূপে স্বীকার করা হয়। এই অবস্থায় পৃথিবীর অণু-পরমাণুর দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হউক বা আত্মাসমূহের উপর, বা দৈহিক অবক্ষয়ের উপর দৃষ্টি-পাত করা হউক, নিশ্চিতরূপে মানিতে হইবে যে, এই সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন স্রষ্টা আছেন।

খোদাতা'লাকে সনাক্ত করার দ্বিতীয় উপায় তাঁহার তরতাজা নিদর্শন, যাহা নবী ও

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

হইল 'মুরতাশি', যাহার অর্থ ঘুষ গ্রহণকারী। শব্দটি 'রাশি' নহে। লেখরামের বিদ্যার দৌড় এতটুকু যে, সে 'মুরতাশি' এর স্থলে 'রাশি' লেখে)। আমি বেদের আলোকে এক ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস রাখি যে, চারিটি বেদ নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ইহাদের মধ্যে এক বিন্দু বিসর্গও ভ্রান্তি বা মিথ্যা বা কোন গল্প-কাহিনী নাই। এইগুলিকে সর্বদা প্রত্যেক নূতন যুগে পরমাত্মা জগতের সাধারণ হেদায়াতের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টির সূচনায় যখন মানব সৃষ্টি শুরু হয়, তখন পরমাত্মা বেদ সমূহের শ্রী অগ্নি, শ্রী বায়ু, শ্রী আদত ও শ্রী আংরা জীব চার জন ঋষির আত্মায় ইলহাম করেন। কিন্তু জিবরায়েল বা ডাক পিয়নের মাধ্যমে করেন নাই; বরং স্বয়ং নিজেই

টীকার অবশিষ্টাংশ:

ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর্য সমাজীরা এইগুলিকেও অস্বীকার করে। এই জন্য তাহাদের নিকট নিজেদের পরমেশ্বরের সত্তার কোন যুক্তি-প্রমাণ নাই।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আর্যরা কথায় কথায় তাহাদের পরমেশ্বরকে পিতা পিতা বলিয়া ডাকিয়া থাকে, যেমনটি এখনই লেখরাম তাহার মোবাহালার বিষয়-বস্তুতে লিখিয়াছেন। কিন্তু জানিনা তিনি কি ধরনের পিতা। তিনি কি এই ধরনের পিতা, যেমন এক পোষ্যপুত্র এক অজানা ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলিয়া থাকে, বা এইরূপ পিতা, যাহাকে 'নিয়োগ' এর মাধ্যমে কাল্পনিকভাবে পিতা বানানো হয়? এই ব্যবস্থায় এক আর্য স্ত্রীলোক নিজের সতীত্বকে ধূলায় মিশাইয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এইভাবে ঐ স্ত্রী লোকের স্বামী শিশুর পিতা হইয়া যায়। 'নিয়োগ' প্রথার মাধ্যমে এই শিশু লাভ করা হয়। অতএব এইভাবেই যদি পরমেশ্বর আর্যদের পিতা হয় তবে আমার কথা বলার কোন অবকাশ নাই। কিন্তু যদি এই ধরনের পিতা হয় যে, আত্মাসমূহ এবং পৃথিবীর অণু-পরমাণুসমূহ তাহাদের সকল শক্তিসমেত তাঁহার হাত হইতে বাহির হয় এবং তাঁহার দ্বারাই অস্তিত্বে আসে, তবে ইহা আর্যদের নীতি-পরিপন্থী। যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা কেন তাহাদের নীতির পরিপন্থী, তবে বলা বাহুল্য যে, আর্যদের নীতি মোতাবেক সকল আত্মা পরমেশ্বরের আদি অংশীদার, যাহারা তাঁহার দ্বারা অস্তিত্বে আসে নাই। তাহা হইলে আমরা পরমেশ্বরকে কীভাবে তাহাদের পিতা বলিতে পারি? তাহারা তো নিজে নিজেই আসে, যেমন পরমেশ্বর নিজে নিজেই আছেন। কিন্তু এই নীতি ভ্রান্ত। তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষু দ্বারা যাহারা দেখেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পিতার মধ্যে যেরূপ শক্তি, প্রকৃতি ও স্বভাব থাকে সেরূপ শক্তি, প্রকৃতি ও স্বভাব পুত্রদের মধ্যেও পাওয়া যায়। অতএব অনুরূপভাবে যেহেতু আত্মাসমূহ

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

করিয়াছেন।□ কেননা, তিনি আকাশে বা আরশে নাই; বরং তিনি সর্বব্যাপী। আমি ইহাও মানি যে, বেদই সকলের চাইতে অধিক পরিপূর্ণ ও পবিত্র জ্ঞানের পুস্তক। আর্যাবর্ত হইতেই সমগ্র জগদ্বাসী ফযিলত শিখিয়াছে। আর্যরাই সকলের প্রথম শিক্ষক। মুসলমানদের কথা অনুযায়ী আর্যাবর্তের বাহিরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঁচ ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, কুরআন, প্রভৃতি কেতাব আনিয়াছেন। আমি এই সকল কেতাব অধ্যয়নের ও বুঝার পর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, এইগুলির সকল ধর্মীয় শিক্ষা বানায়োট ও জাল এবং এইগুলিকে প্রকৃত ইলহামের

টীকার অবশিষ্টাংশ

খোদাতা'লার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, সেহেতু তাহারা প্রতিচ্ছায়া রূপে ঐ সকল গুণ লাভ করে যাহা খোদার সত্তার মধ্যে মজুদ আছে। খোদার বান্দারা যে পরিমাণে তাঁহার ভালবাসা ও উপাসনার মাধ্যমে গুণাবলী ও পবিত্রতায় উন্নতি করিতে থাকে সে পরিমাণে ঐ সকল গুণ ও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। এমনকি প্রতিচ্ছায়া রূপে এইরূপ লোকদের মধ্যে খোদার জ্যোতির বিকাশ আরম্ভ হইয়া যায়। সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে খোদার পবিত্র স্বভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহা নফ্সের পবিত্র-করণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, খোদা দয়ালু। তদ্রূপেই মানুষও নফ্সের পবিত্রকরণের পর দয়া গুণ হইতে অংশ লাভ করে। খোদা মহান দাতা। তদ্রূপেই মানুষও নফসের পবিত্রকরণের পর মহান দাতার দয়া গুণ হইতে অংশ লাভ করে। তদ্রূপেই খোদা সত্তার (যিনি দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখেন)। খোদা করুণাময়। খোদা ক্ষমাশীল। মানুষও নফসের পবিত্র-করণের পর এই সকল গুণ হইতে অংশ লাভ করিয়া থাকে। অতএব কে এই সকল অতিরিক্ত গুণ মানুষের আত্মায় রাখিয়া দিয়াছেন? যদি খোদা রাখিয়া থাকেন তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি আত্মাসমূহের স্রষ্টা। যদি কেহ বলে এইগুলি নিজে নিজেই আছে তবে ইহার উত্তরে এই কথা বলাই যথেষ্ট হইবে যে,

لعنة الله على الكاذبين (অর্থ—মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক—অনুবাদক)।

□ টীকা।—শারিরীক ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, মানুষ বাতাসের সাহায্যে শুনে ও সূর্যের সাহায্যে দেখে। তাহা হইলে শারিরীক ব্যবস্থাপনায় এই দুইজন ডাক পিয়নকে কেন নিযুক্ত করা হইয়াছে? অথচ খোদার শারিরীক ও আধ্যাত্মিক বিধান পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আফসোস, বেদের জ্ঞান সর্বত্র বিশ্ব প্রকৃতির পরিপন্থী

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায়)

বদনামকারী লেখা বলিয়া মনে করি। এইগুলির সত্যতার প্রমাণ লোভ-লালসা বা নির্বুদ্ধিতা বা তলোয়ার ছাড়া কিছুই নাই। যেভাবে আমি ন্যায়-পরায়ণতার পরিপন্থী কথাকে ভ্রান্ত বলিয়া জানি, তদ্রূপেই কুরআন এবং উহার নীতিসমূহ ও উহার শিক্ষাসমূহ, যাহা যাহা বেদের বিরোধী, তাহাদিগকে আমি ভ্রান্ত ও মিথ্যা মনে করি (লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন)। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ মির্যা গোলাম আহমদ কুরআনকে খোদার বাক্য বলিয়া জানে এবং উহার সব শিক্ষাকে সত্য ও সঠিক মনে করে। যেভাবে আমি কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া জানি, তদ্রূপেই সংস্কৃত ও নাগরীতে অজ্ঞ ঐ নিরক্ষর না পড়িয়া বা না দেখিয়া বেদসমূহকে ভ্রান্ত মনে করে।*

বলিয়া দৃষ্টিগোচার হয়। কে বলে খোদা সর্বত্র নাই? বরং তিনি সব স্থানেই আছেন এবং আরশেও আছেন। নির্বোধ ব্যক্তি এই তত্ত্বজ্ঞানের গুঢ় রহস্য বুঝে না। এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যদিও এই বিশ্বে সব কিছু খোদাতা'লার আদেশে হয় তবুও তিনি তাঁহার অমোঘ বিধান কার্যকর করার জন্য মাধ্যম রাখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষ যাহা মানুষকে বিনাশ করে এবং একটি প্রতিষেধক যাহা উপকারে আসে, ইহাদের ব্যাপারে আমরা কি ধারণা করতে পারি যে, এইগুলি নিজে নিজেই মানুষের দেহে ক্রিয়া করে? কখনো নহে। বরং ইহারা খোদার আদেশে প্রতিকূল বা অনুকূল ক্রিয়া করে। অতএব এইগুলিও এক ধরনের ফেরেশ্‌তা। বরং বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু দ্বারা নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। ইহারা সকলেই খোদার ফেরেশ্‌তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রতিটি অণু-পরমাণুকে খোদাতা'লার ফেরেশ্‌তা বলিয়া মানি, ততক্ষণ পর্যন্ত তওহীদ পূর্ণ হয় না। কেননা, পৃথিবীতে যত ক্রিয়াশীল বস্তু আছে, যদি আমরা ঐগুলিকে খোদার ফেরেশ্‌তা বলিয়া স্বীকার না করি তবে আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের শরীরের ও সমগ্র বিশ্বের নানাবিধ পরিবর্তন খোদাতা'লার জ্ঞান, ইচ্ছা ও মর্জি ছাড়াই আপনা আপনিই সংঘটিত হইতেছে। এমতাবস্থায় খোদাকে কেবল নিষ্ক্রিয় ও অজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব ফেরেশ্‌তাদের উপর ঈমান আনার রহস্য এই যে, তাহারা ছাড়া তওহীদ কায়েম থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটি বস্তুকে এবং প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে খোদাতা'লার ইচ্ছায় মানিতে হয়। ফেরেশ্‌তার ধারণা তো ইহাই যে, তাহারা ঐ সকল বস্তু যাহারা খোদার আদেশে কাজ করিতেছে। অতএব যেক্ষেত্রে এই বিধান নিশ্চিত ও স্বীকৃত সেক্ষেত্রে জিব্রায়েল ও মিকায়েলকে কীভাবে অস্বীকার করা যায়?

(টীকাটি অপর পাতায় দেখুন)

হে পরমেশ্বর! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায় ফয়সালা কর। কেননা, মিথ্যাবাদী কখনো সত্যবাদীর ন্যায় তোমার দরবারে সম্মান পাইতে পারে না।

লেখক

আপনার বিনীত বান্দা লেখরাম শরমা
সভাসদ, আর্য সমাজ, পেশোয়ার
বর্তমানে সম্পাদক, আর্য গেজেট
ফিরোজপুর, পাঞ্জাব

মোবাহালার দোয়ার পর, যাহা পণ্ডিত লেখরাম তাহার পুস্তক খব্‌তে আহমদীয়ার ৩৪৪ হইতে ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে, খোদা যাহা কিছু আকাশ হইতে ফয়সালা করিয়াছেন এবং যেভাবে তাহার মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনার প্রকাশ ঘটে ও সত্যবাদী সম্মান লাভ করে—এই সব কিছুই ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ রোজ সোমবার চার ঘটিকার পর বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

দেখ ইহাই খোদার ফয়সালা, যে ফয়সালা লেখরাম তাহার পরমেশ্বরের নিকট হইতে চাহিয়া ছিল যাহাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হইয়া যায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে একটি নিদর্শন নহে, বরং দুইটি নিদর্শন আছে। প্রথমটি এই যে, লেখরাম নিহত হওয়ার ব্যাপারটি নিজেই একটি আযীমুশ্শান ভবিষ্যদ্বাণী, যাহাতে তাহার নিহত হওয়ার দিন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, মৃত্যুর ধারণা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে,

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

---

* টীকা: যদি আমি বেদ না পড়িয়া থাকি, তবে ইহাতো সুখের কথা যে, লেখরাম চারটি বেদই মুখস্ত করিয়াছে। এখানেও 'লা'নতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলা ছাড়া আর কী বলিতে পারি? বিতর্ক নীতির উপর হইয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে আর্য সমাজীরা নিজেদের হাতে বেদের নীতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐগুলির উপর প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির বিতর্ক করার অধিকার রহিয়াছে। ইহা সরাসরি ভ্রান্ত কথা যে, আমি বেদ পড়ি নাই। বেদের ঐ অনুবাদ যাহা এই দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি উহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি। পণ্ডিত দয়ানন্দের বেদ ভাষ্যও আমি পড়িয়াছি। প্রায় ২৫ (পঁচিশ) বৎসর ধরিয়া আর্যদের সহিত আমার সরাসরি বিতর্ক হইতেছে। এমতাবস্থায় এই কথা বলা কত বড় মিথ্যা যে, আমি বেদ সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি আর্যদের পণ্ডিত এখনও লেখরামকে বেদের বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করে তবে আমার ঐ সার্টিফিকেট দেখার সখ আছে। প্রকৃত পক্ষে লেখরামের মর্যাদা ইহার চাইতে এক তিলও বেশী নহে, যাহা খোদা তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, عِجْلٌ جَسَدٌ لَهُ خُوَارٌ (অর্থ:—সে একটি গোবৎসওলা দেহ সর্বস্ব ব্যক্তি, যাহার মধ্য হইতে অর্থহীন শব্দ নির্গত হয়।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

(১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৬ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

তোমাদের চূড়ান্ত যে মঞ্জিল, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নূরের মঞ্জিল। তবে এই নূরের মঞ্জিলের পথে তোমাদের অস্বচ্ছলতা ও স্থূলতা প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ হবে সেজন্যে যাত্রার সূচনা হবে খোদার উদ্দেশ্যে এরূপ খাঁটি তওবার দ্বারা, যা তোমাদেরকে পাক-সাফ করার উপযোগী ও পুরাপুরি তোমাদেরকে ধৌতকারী হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ইলাহী নূর প্রদান করা হয় ততক্ষণ মানুষ তার দোষ-ত্রুটিগুলোও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই ইলাহী নূরের মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তো নসিহত করা হয়েছে যে, এখন পদক্ষেপ 'তওবা নসূহ্' দ্বারা গ্রহণ কর, তবেই কিনা ঐ মঞ্জিলের দিকে এসে যাবে।

তাশাহুহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্-তাহ্‌রীমের ৯ম আয়াত তেলাওয়াত করেন :

يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا - عسى ربكم ان يكفر عنكم سياتكم ويدخلكم جنت تجرى من تحتها الانهر - يوم لا يخزى الله النبى والذين امنوا معه - نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا - انك على كل شيء قدير ٥

অতঃপর তিনি বলেন : 'নূর' সম্পর্কেই ধারাবাহিকভাবে খোৎবাসমূহ অব্যাহত রয়েছে। আগামীতেও হয়তো আরও কয়েকটি খোৎবা এতোদ্দেশ্যেই বরাদ্দ থাকবে। অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়-বস্তু। সেজন্যে স্বল্প সময়ে সংক্ষেপেও যদি বর্ণনা করা হয়, তবুও উহা পুরাপুরি উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপ বলতে বুঝায় এই যে, এরূপ সংক্ষেপে, যদ্দরুন কিছুই বুঝা না যায়—তা করা তো যায় কিন্তু এর কোন ফায়েদা নেই। অতএব, পুরাপুরি এবং সংক্ষেপে বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বক্তব্য বিষয় বোধগম্য হয়, সেই পরিমাণ সংক্ষেপ। কাজেই চেষ্টা আমি করি যাতে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সবিস্তারে কোন কোন বিষয় বুঝাতে হয়, যেসব বিষয়ে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে বিস্তারিত তত্ত্ব-তথ্য মজুদ রয়েছে। সেদিক থেকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ। নইলে, আপাতঃ যা দেখা যায়, আমি কথাগুলো খোলাসা করেই উপস্থাপন করছি।

যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এর তরজমা হচ্ছে :

"হে যারা ঈমান এনেছ! "তূবূ ইলাল্লাহে তাওবাতান নাসূহা"—আল্লাহ্‌র সমীপে সর্বতঃ খাঁটি (নিষ্ঠাপূর্ণ) তওবার মাধ্যমে ঝুঁকে যাও, তাঁর দিকে রুজু হও। 'নসূহা' শব্দের অর্থ নিখুঁত, নির্ভেজাল ও সম্পূর্ণ খাঁটি—যে খালেস ও সত্যিকার তওবা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয় এবং যা (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দ্বারা) পাক-সাফ ও পবিত্র করার কারণ হয়। "আসা রাব্বুকুম আই ইউকাফ্‌ফিরা আনকুম সাইয়েয়াতিকুম"—অর্থাৎ, তওবা তোমরা করবে এবং 'সাফাই' (পবিত্রতা) আল্লাহ্‌ দান করবেন। তওবার যদ্দুর সম্পর্ক উহার 'নসূহ্‌' হওয়ার বিষয়টি তোমাদের অন্তরের পবিত্রতা এবং খাঁটি ও দৃঢ়সংকল্পের সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু নিজেকে পবিত্র করার তওফীক মানুষ নিজেই লাভ করতে পারে না। যদি ইরাদা (ইচ্ছা) নেক ও সৎ হয়, সেই সাথে চেষ্টা নিষ্ঠাপূর্ণ হয় তাহলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে : "আসা রাব্বুকুম আই ইউকাফ্‌ফিরা আনকুম সাইয়েয়াতেকুম"—যদি এরূপ হয় তাহলে ইহা কোন সুদূর পরাহত ব্যাপার নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রভু (রাব্ব্‌) তোমাদের দুর্বলতাগুলো দূর করে দিবেন। তোমাদের খারাপিগুলো তোমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে-সারিয়ে দিবেন। "ওয়া ইউদ্‌খিলাকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু"—তারপর তোমাদেরকে ঐ জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। "ইওমা লা ইউখ্‌যিল্লাহুন-নাবীয়া ওয়াল্লাযীনা আমানূ মায়াহু"—সেই দিন আল্লাহ্‌-তা'লা এই নবীকে অপমানিত করবেন না এবং তাদেরকে যারা তার সঙ্গে আছে বা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। "নূরুহুম ইয়াস্‌আ বাইনা আইদীহিম ওয়া বি-আইমানিহিম"—তাদের নূর তাদের সম্মুখেও ছুটে চলবে এবং তাদের ডান দিকেও। "ইয়াকুলূনা রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা"—তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রাব্ব্‌! আমাদের নূরকে পূর্ণ-পরিণত কর, "ওয়াগফির লানা"—আমাদেরকে বখ্‌শিশ দাও, ক্ষমা ভিক্ষা দাও; "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ বিষয়টি হচ্ছে যে, মাগফিরাতের এবং ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করার শর্ত হলো 'তওবা নসূহ্‌'। এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, তাঁর মধ্যে কোনও মলিনতা ছিল না, যার অর্থ হচ্ছে, এমন কোনও ত্রুটি ছিল না, যা তাঁর আত্মার নিষ্ঠা ও পবিত্রতায় বিন্দু মাত্রও দাগস্বরূপ হতে পারে; অথবা খোদার সাথে সম্পর্কের পথে অন্তরায় হতে পারে অথবা তাঁর নূরের রাস্তায় কোন পর্দা বা আবরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যার দরুন তিনি পুরাপুরি খোদার নূর আহরণে অপারগ হতে পারেন। মুমেনদের মধ্যে সকলের তো এই মাকাম হাসিল নয়। কিন্তু আদেশ এই যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সঙ্গী হও। বাধ্যকর

করে দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পায়রবী কর তাঁর, মতন (তাঁর অনুরূপ) হওয়ার চেষ্টা কর। সেজন্যে 'তওবা নসূহ' দ্বারা বুঝায় এই যে, [illegible] (নিখুঁত) হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, তোমাদের চূড়ান্ত যে মঞ্জিল, তা হচ্ছে আল্লাহর নূরের মঞ্জিল। তবে এই নূরের মঞ্জিলের পথে তোমাদের অস্বচ্ছতা ও স্থূলতা প্রতি-বন্ধকতাস্বরূপ হবে, সেজন্যে যাত্রার সূচনা হবে খোদার উদ্দেশ্যে এরূপ খাঁটি তওবার দ্বারা, যা তোমাদেরকে পাক-সাফ করার উপযোগী ও পুরাপুরি তোমাদেরকে ধৌতকারী হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও খোদার ফযল ব্যতিরেকে এবং তাঁর খাস কুদরত ব্যতিরেকে তোমাদের ত্রুটিগুলো দূরীভূত হতে পারে না। তদুপরি ইহা এজন্যেও গুরুত্বপূর্ণ যে, সচরাচর (সাধারণতঃ) মানুষ নূর লাভ করার পূর্বে নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আর অদ্ভুত সমস্যা হচ্ছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ইলাহী নূর প্রদান করা হয় ততক্ষণ মানুষ তার দোষ-ত্রুটিগুলোও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই ইলাহী নূরের মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তো নসিহত করা হয়েছে যে, প্রথম পদক্ষেপ 'তওবা নসূহ' দ্বারা গ্রহণ কর, তবেই কিনা ঐ মঞ্জিলের দিকে এসে যাবে। এবং পরিশেষে নূর প্রদানের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এই বলে ওয়াদা দেয়া হয়েছে যে, "আমরা জানি যে, তোমাদের মাঝে দুর্বলতাসমূহ রয়েছে। ওগুলো থাকতে তোমাদের পক্ষে নিজেদের সনাক্ত (ও বিশ্লেষণ) করাই সম্ভবপর নয়। কাজেই তোমাদের আত্ম-সত্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ বা আত্ম-দর্শনের জন্যে যে নূরের প্রয়োজন, যদি তা-ও হাসিল না হয়, তাহলে কি করেই বা মানুষ নিজের দুর্বলতাগুলো নিরসনে সক্ষম হতে পারবে? আপাতঃ এই জটিল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এই যে, তোমরা এই কর, আমরা এই করবো। তোমরা নিয়্যত সাফ কর, পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে, যার মধ্যে থাকবে না কোন দুনিয়ার মলিনতা ও কলুষতা, নিয়্যতগুলোতে হবে না কোন গরল। এরূপ নিয়্যতের সাথে যখন সংকল্পবদ্ধ হবে যে, তোমরা প্রত্যেক কলুষতার দাগ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ও পবিত্র করবে, তখন আল্লাহ্‌-তা'লা কি করবেন? "আসা রাব্বুকুম আই ইউকাফ্‌ফিরা আনকুম সাইয়েআতিকুম"—তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, ইহা কোন সুদূর পরাহত ব্যাপার নয়—'আসা' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী, অর্থাৎ তোমরা সব ধরনের কলুষ হতে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার যে বিষয়-টাকে সুদূর পরাহত বলে ভাবছো উহা আল্লাহ্‌র কাছে তদ্রূপ নয়, বরং এত সহজ যে, অচিরেই তিনি তোমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করে দিবেন। আর এ সব হচ্ছে ঐ শর্তাবলী, যা পূর্ণ হওয়ার পর "ইউদ্‌খিলুকুম জান্নাতিন"—উক্ত অবস্থা ও মাকাম যতক্ষণ পর্যন্ত হাসিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ সব জান্নাতে প্রবিষ্ট হবার যোগ্য হতে পারে না যে-সব জান্নাত হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সংসর্গ ও সাহচর্যের

সাথে সম্পর্কযুক্ত। এখানে যেহেতু প্রত্যেক জান্নাতের বিষয়-বস্তু নয়, বরং এরূপ জান্নাতের সম্পর্ক—যা অাঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে বা তাঁর সঙ্গে অবস্থান করার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, তারা ঐ সকল জান্নাতে কবে ও কখন প্রবিষ্ট হবে? "ইওমা লা ইউখ্‌যিল্লাহুন্‌ নাবীয়া ওয়াল্লাযীনা আমান্‌ মায়াহু"—যে-দিন আল্লাহ্‌ লজ্জিত ও অপমানিত করবেন না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে বা তাঁর উপর ঈমান এনেছে—উভয় অর্থই এর অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুতঃ অাঁ-হযরত (সাঃ) এবং মুমেনদের অপমানিত না হওয়ার বিষয়টির উল্লেখ কোন বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। তা এই যে, কোন ব্যক্তির সাথীরা যদি মন্দ হয়, তাহলে ওদের কারণে অনেক সময় তাকে অপমান পোহাতে হয়। সন্তানরা খারাপ হলে খোঁচা দেয়া হয় মা-বাপকে যে, দেখ, তোমাদের সন্তানরা কী ধরনের সৃষ্টি হয়েছে। কোন সময় তাদেরকে অসিহত করার উদ্দেশ্যে, তাদেরকে নাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়, দেখ না তোমরা কোন্‌ মা-বাপের সন্তান?! অতএব, উক্ত অর্থেই বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে ঐ জান্নাতে সঙ্গদানের জন্যে তোমাদেরকে হকদার ও উপযোগী করে তোলা হবে। তবেই কি না তোমরা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। এতদ্ব্যতিরেকে তো রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষে এক রকম অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যে, তিনি নিজে এতো পরিপূর্ণ ও মহান এবং এতো প্রভাবশীল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখ, কীরূপ লোকজন ঘুরে ফিরছে! তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, ঐ দিন ঐ সকল লোকই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র সহচর হবে যারা এই তওবার সৌভাগ্য লাভ করবে। যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি হতে দাগমুক্ত হবার চেষ্টা করবে। অবশ্য আল্লাহ্‌তা'লার কযল তাদেরকে দাগমুক্ত করবে। তাদের দুর্বলতাগুলিকে দুর করে দিবে। তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন, এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্য এরূপ শান ও মর্যাদার সাথে প্রদান করা হবে যে, তাদের সঙ্গ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে কোন লজ্জার কারণ হবে না। এরা হবে ঐসব লোক, "নূরুহুম ইয়াস্‌য়া বাইনা আইদীহিম ওয়া বি-আই-মানিহিম"—যাদের নূর তাদের আগে আগে সম্মুখ পানে ছুটে চলবে এবং তাদের ডান দিকেও। ডান দিকের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন করীমে দু'টি স্থলে নূরের সম্মুখ এবং ডান দিকে ছুটে চলার উল্লেখ আছে। বাম দিকে কেন নয়? মানুষ তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেদিকে যায় ওদিকটাই আলোকিত হওয়ার আবশ্যক। কখনও আপনারা টর্চ নিয়ে এরূপ ব্যক্তিকে যেতে দেখবেন না, যে তার পেছন দিকে টর্চ ধরে এবং সম্মুখে যেতে থাকে। এখানে একটি মর্ম ইহাও যে, তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ পুণ্যের দিকে গৃহীত হয়। ডান হাত (বা দিক) পুণ্যের প্রতীক। সেজন্যেই মুমেনগণ, যারা জান্নাতের

সুসংবাদ লাভ করবে তাদেরকে তাদের 'কিতাব'—পুণ্যকর্মের কিতাব তাদের ডান হাতে ধরানো হবে। আর বা-হাত হচ্ছে পাপের প্রতীক। সেজন্যে পাপীদেরকে তাদের 'কিতাব' (কর্মলিপি) তাদের বাম হাতে ধরানো হবে। অতএব, জান্নাতে তো প্রত্যেক পদক্ষেপ কেবল ডান অর্থাৎ পুণ্যের দিকেই উত্থিত হবে এবং তারা সম্মুখে এগিয়ে যাবে।

উক্ত দু'টি অবস্থাকে নূরের দু'টি দিকের বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এ বলে যে, এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক, যারা এখন আর পুণ্য ছাড়া অন্য কোনও দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না এবং তারা সদা অগ্রসরমান হতে থাকে। এই হচ্ছে ঐ কাফিলা, এবং এই হবে সেই সফর জান্নাতসমূহে। কাজেই, এই যে ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গী যে, জান্নাতে একবার গেলে সেখানে তারপর হবে কেবল খানা-পিনা এবং আরাম আয়েশ, আর কাউচে (Couch) হেলান দিয়ে বসে থাকা, এটাই যেন সেখানকার চূড়ান্ত প্রাপ্তি—ঐ ধারণাটাকে উক্ত আয়াত সর্বতোভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, জান্নাতও অনন্ত উন্নতির স্থান, যেখানে স্থবিরতা নেই। কেননা, থেমে যাওয়া মৃত্যুরই অপর নাম, এবং ইহা অবনতির সূচনাও বটে। কিন্তু জান্নাতের জীবনে মৃত্যু নেই এবং অবনতিও নেই। সেজন্যে ইহা অপরিহার্য যে, জান্নাতে সব সময় মানুষ অগ্রসরমান হবে। আর এজন্যেও ইহা অপরিহার্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নূতন পরিবর্তন না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ উপভোগকে কায়েম রাখতে পারে না। স্বাদ-অনুভব হতে থাকলেও যদি একই স্থানে থেমে যায় তাহলে সেখানেই উহা ক্রমশঃ বিস্বাদে ও অতৃপ্তিবোধে পরিবর্তিত হয়, যাকে বলা হয় (Boredom) অর্থাৎ মানুষ যেখানে 'বোর' হয়ে যায়। অতএব, সচলতায় ও পরিবর্তনের মাঝে প্রবহমান আস্বাদন নিহিত রয়েছে, এবং উহা সর্বদা চরিঅগ্রসরমান হতে থাকে। অতএব, সেই জান্নাত, যেখানে নিশ্চলতা হবে সে জান্নাত তো কোন কাম্য বস্তুই নয়। "কাজেই মূরুহুম ইয়াস্‌য়া বাইনা আইদীহিম ওয়া বি-আইমানিহিম"। এমতবস্থায় তারা কী বলবে? আল্লাহ্ বলছেন, "ইয়াকূলূনা রাব্বানা আত্‌মিম লানা নূরানা ওয়াগ্‌ফির লানা"—তারা বলবে, হে আমাদের রব্ব্ (ক্রমোন্নতিদাতা প্রভু—অনুবাদক)! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণতা দান কর। অতএব, নূরের পূর্ণতা এমন এক বিষয় যার কোন পরিসমাপ্তি (বা সর্বশেষ প্রান্ত) নেই। কেননা, নূরের সম্পর্ক আল্লাহ্‌তা'লার (অনন্ত) সত্তার সাথে বিজড়িত এবং উহা তাঁরই পক্ষ থেকে দান করা হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লারই দিকে বাড়তে থাকার যোগ্যতা ও সক্ষমতাকেই নূর নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেহেতু কাম্য হচ্ছেন অসীম ও অনন্ত সত্তা, যার কোন শেষপ্রান্ত নেই, সেহেতু অনিবার্যতঃ এই নূর সদা বাড়তে থাকবে। তবেই কিনা কদম খোদার দিকে বাড়বে। অতএব, পূর্বে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, তাদের সম্মুখেও নূর ছুটে যেতে থাকবে এবং তাদের ডানদিকেও,

সেই মঞ্জিলে পৌঁছার উদ্দেশ্যে, যা হচ্ছে এক অনন্ত সফর, কিন্তু সর্বদা অধিকতর পুণ্য অর্জনকারী সফর, সে-দিকে ইঙ্গিত দিয়ে এই দোয়া শিখান হয়েছে, বা জানান হয়েছে যে, মুমেনরা জান্নাতে মুহাম্মদুরসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে সর্বদা এই দোয়া করতে করতে নিজেদের সফর সদা অব্যহত রাখবে : "রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা"—আমাদের নূরকে পরিপূর্ণতা দান করতে থাক ; "ওয়াগ্ ফিরলানা"—এবং আমাদেরকে মাগফিরাত (বা বখ্শিশ) দান কর। "ইন্নাকাআলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম।

এখন বখ্শিশ বা ক্ষমা চাওয়ার যদ্দূর সম্পর্ক, এ প্রসঙ্গে এই সমস্যা বা প্রশ্ন থেকে যায় যে, জান্নাতে আবার কী গোনাহ্ হবে যেজন্যে মাগফিরাত ও বখ্শিশের এই প্রার্থনা ? প্রসঙ্গত: এ বিষয়টি আঁ-হুযরত (সা:) কর্তৃক মাগফিরাতের দোয়া চাওয়ার রহস্যও উদঘাটন করছে। বস্তুত: মাগফিরাত বা বখ্শিশ মূলত: পাপের উপস্থিতিকে চায় না। ইহা জরুরী নয় যে, গোনাহ্ ব্যতিরেকে মাগফিরাত বা বখ্শিশ চাওয়া যায় না। বখ্শিশের মাঝে প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু বিষয়-বস্তু নিহিত আছে এবং নূরের অধিকারীদের ক্ষেত্রে মাগফিরাত বা বখ্শিশ ভিন্ন কোন অর্থ বহন করে। সেই নূর, যা পূর্ণতায় পৌঁছায় নি, তদুপরি যখন (এই পথে) সফরকারীগণ রয়েছেন বহুসংখ্যক এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকের নূরের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন—তাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী নূর লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্তা'লা এমন কোন অটল ফয়সালা করেন নি যে, জোরপূর্বক কাউকে কম, আর কাউকে বেশী করে নূর দান করেন। নূর কম বা বেশী হওয়ার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের দুর্বলতাগুলোর সাথেও হতে পারে। আবার ঐ সব সাবেক (পূর্ববর্তী) কৃতকর্মের সাথেও, যার ফলশ্রুতিতে তাদের ঐ নূরানী চেহারা বা আকৃতি তৈরী হয়েছে, যে চেহারা ও আকৃতি নিয়ে তারা জান্নাতে ভ্রমণ করবে। কাজেই তারা নূর চাওয়ার পর—এই বলে যে, আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ কর, সেই সাথে এই দোয়াও করবে : 'ওয়াগফির লানা'—'যদি উহা কামিল ও পূর্ণ না হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় আমাদের মাঝে আমাদের কিছু কিছু গোপনীয় (প্রচ্ছন্ন) দুর্বলতা অবশিষ্ট থেকে গেছে, আমাদের চেষ্টা-সাধনায় কিছু অভাব-ত্রুটি ঘটে থাকতে পারে—মোট কথা, কোন বিষয় এরূপ তো নিশ্চয় আছে, যার দরুন আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত কম নূর দান করা হয়েছে।"

অতএব, ঐ যে কাফিলাটি, উহাতে শামিল সবার নূর সমান সমান নয়। এই কাফিলায় শামিল প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া যেমন উক্ত অর্থে পৃথক পৃথক, তেমনি তার বখ্শিশ ও ক্ষমার বিষয়-বস্তুও পৃথক পৃথক। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বখ্শিশের বিষয়-বস্তুও —যেমন কিনা আমি বর্ণনা করেছি—তাঁর ইহকালীন জীবনেও মাগফিরাতের দোয়াসমূহ

কোনও গোনাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। বখ্‌শিশের বিষয়-বস্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের উর্দু ও পাঞ্জাবী ভাষায় (এবং বাংলা ভাষায়ও—অনুবাদক) যাকে বখ্‌শিশ বলা হয় উহার সাথেও এক ঐক্যের সম্পর্ক রাখে। কেননা, 'গুফরান' (বা মাগফিরাত) এরূপ অনুদানের সাথেও সম্পর্কযুক্ত, বান্দা যা পাওয়ার হকদার হয়ে উঠে না, তবুও সে উহা চায়। নইলে, গোনাহ্‌গারকে কখনও ক্ষমাই করা যায় না। গোনাহ্‌গারের ক্ষমা লাভ তার হকদার হওয়ার দরুন নয় বরং উহা ঐকান্তিকভাবে নিছক দানের সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্যেই হয়তো পাঞ্জাবী ভাষায় বিশেষতঃ এবং উর্দু ভাষায়ও 'বখ্‌শিশ' শব্দটি জায়গা করে নিয়েছে, এই বলে যেমন, আমাদেরকে বখ্‌শিশ (দান) করুন"-এর দ্বারা এরূপ দানকে বুঝায়, যার হকদার (যথাযথ অধিকারী বা প্রাপক) আমরা কখনও নই; কেবল নিজের ফযল, দয়া ও অনুগ্রহ ক্রমে আমাদেরকে দান করুন। অতএব, আমি মনে করি যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কর্তৃক বখ্‌শিশ ও মাগফিরাত লাভের দোয়াসমূহ উক্ত বিষয়-বস্তুর সাথেই সম্পৃক্ত ছিল, তাছাড়া উহাতে আরও বিষয়াদিও নিহিত রয়েছে। কিন্তু উক্ত অর্থ ও বিষয়টি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টিগোচরে থাকে। এবং এখানে (উল্লেখিত) জান্নাতে বখ্‌শিশের (বা ক্ষমা লাভের) দোয়া চাওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, উক্ত প্রতিপাদন অশুদ্ধ নয়। কেননা, জান্নাতে তো কোনও গোনাহ্‌ হবে না। প্রবিষ্টও তখন করা হলো যখন দুর্বলতা-গুলো দূর করে দেয়া হয়েছে এবং ক্ষমাও করা হয়েছে। সাবেক গোনাহ্‌গুলোর সাথে সম্পর্ক কেটে দেয়া হয়েছে। কাজেই, যদিও মানুষ ইহাও ভাবতে পারে যে, হয়তো বা তারা (জান্নাতীরা) অতীতের ঐ সব দুর্বলতার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যার ফলশ্রুতিতে তাদের নূরের পূর্ণতালাভের ক্ষেত্রে কিছুটা (অপেক্ষাকৃত) কমতি রয়ে গেছে; কিন্তু যেহেতু এই কাফিলার অধিনায়ক হচ্ছেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ), যাঁকে সূচনা থেকে নূর (স্বরূপ) বানানো হয়েছিল এবং পাক-পবিত্র ও সব রকম দোষ-ত্রুটি হতে বিমুক্ত, এমন কি কাশ্‌ফী প্রক্রিয়ায় বাল্যকালে তাঁর অন্তঃকরণকে পুনরায় ধৌত করা হয়, অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি বা জন্মলাভের পরেও কাশ্‌ফী অবস্থায় ফিরিশ্‌তারা নাযেল হয় এবং তারা তাঁর হৃদয়কে ধৌত করে। সেহেতু যিনি এতো পবিত্র এবং এতো নিষ্পাপ হবার সৌভাগ্যের অধিকারী, তাঁর ক্ষেত্রে যখন বখ্‌শিশ বা ক্ষমা লাভের দোয়ার সম্পর্কে মানুষ চিন্তা করে তখন উহা দুনিয়াতে সাধারণভাবে যা বুঝায় সে অর্থে কখনও হতে পারে না। কেবল 'যুনূব' সম্পর্কীয় ব্যাখ্যার আলোচনা অবশিষ্ট থেকে যায়। সে সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, উহা পৃথক একটি ব্যাপক (আলোচনা সাপেক্ষ) বিষয়-বস্তু। কিন্তু যখন শুধুমাত্র বখ্‌শিশ (বা গুফরান) শব্দটি আসে, তখন আমার মতে উহার দ্বারা বুঝায় কেবল নিরঙ্কুশ দান, হকদার হওয়ার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ এখানে "যুনূবানা" শব্দের উল্লেখ নেই। বলা হয়েছে: "রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা ওয়াগ্‌ফিরলানা"—হে আমাদের

রব্ব্! আমাদের নূরকে কামিল—পূর্ণ ও পরিণত কর, এবং আমরা এই মঞ্জিল বা মার্গ থেকে সম্মুখে বাড়ার হকদার হই, অথবা না হই তুমি আমাদের সাথে এরূপ বখ্শিশ সুলভ ব্যবহার কর যে, তোমার করুণা যেন আমাদের আয়-অর্জন ও চেষ্টা-প্রয়াসের উর্ধ্বে থাকে এবং ওসব হতে নির্লিপ্ত হয়ে কেবলমাত্র তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—তুমি এ বিষয়েও সর্বসক্ষম, অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়েই সর্বসক্ষম। তুমি চাইলে তোমার বান্দাকে তুমি বিনা হিসেবেই দিতে পার। তুমি চাইলে তার হক-অধিকার ব্যতিরেকেও তাকে দিতে পার। বান্দা যদি অত্যন্ত গোনাহ্গারও হয় তাকেও ধুয়ে মুছে পাক-সাফ ও পবিত্র করতে পার। তোমার মহান সত্তা যখন ওরূপ পরিপূর্ণ ও শক্তিক্রমশালী —প্রত্যেক ব্যাপারেই তুমি সর্বশক্তিমান, তখন আমাদের (উক্ত) দোয়া চাওয়া অযথা নয়।

এই নূর প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি বা একাধিক উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। তেমনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূরের মিসাল বা দৃষ্টান্ত হবার দিক দিয়েও কিছু আরও কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন: "আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরয **অর্থাৎ খোদাতা'লা হচ্ছেন আসল নূর; আকাশ মালা ও ভূমণ্ডলের প্রতিটি নূর তাঁর থেকেই প্রস্ফুটিত হয়েছে।**" এখানে 'আসল নূর' শব্দ দু'টির দ্বারা ইহা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তো বলা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন "মাসালু নূরিহি"—আল্লাহ্র নূরের মিসাল বা তাঁর নূরস্বরূপ। আর সমগ্র বিশ্ব-জগতকে আল্লাহ্র নূর বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর দরুন কেউ যেন ধোঁকা না খায় যে, বিশ্ব-জগতের সমস্ত কিছু তো হচ্ছে আল্লাহ্র নূর এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নূরের কেবল একটি মিসাল বা দৃষ্টান্ত। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রয়োজনের চে' অতিরিক্ত কোন শব্দই রাখেন না। যা আবশ্যকীয় তা অবশ্যই রাখেন। তাই তিনি বলেছেন যে, এখানে "আসল" শব্দটি উহ্য আছে। **অর্থাৎ আল্লাহ্, আকাশমালা ও পৃথিবীর নূর বলতে এই বুঝায় যে, মূলতঃ আল্লাহ্-ই হচ্ছেন 'নূর' এবং অন্যান্য যাকিছু তোমরা দেখতে পাও তা সবই সেই নূরের প্রতিবিম্ব ও বিকাশস্থল স্বরূপ।**

"যমীন ও আসমানের প্রতিটি নূর তাঁর থেকেই নির্গত (বা প্রস্ফুটিত) হয়েছে। অতএব, খোদাতা'লার নাম রূপকভাবে 'পিতা' রাখা যেমন কিনা বাইবেলে তাঁকে পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে "এবং প্রত্যেক নূরের মূল উৎস বলে তাঁকে নির্ধারণ করা—ইহা এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত দান করে যে, খোদাতা'লার সাথে মানবাত্মার কোন অসাধারণ (ভারী) সম্পর্ক বিদ্যমান।"

(নাসীমে-দাওয়াত, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬-৩৮৭)। অর্থাৎ খোদাতা'লার সাথে মানবাত্মার এরূপ কোন সংযোগ রয়েছে, যাকে নূর শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। সে নূর-ই মানবাত্মার আকারে বিকশিত হতে হবে। এখানে ইহাই বুঝানো হয়েছে।

খোদার নূর বলতে কী বুঝায়—এ প্রসঙ্গে সহী মুসলিমে, কিতাবুল ঈমানের ঐ 'বাব' হতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছে, যার শিরোনাম হলো, "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা নিদ্রাগমন করেন না"। হাদীসটি হচ্ছে:

"আনে আবী মুসা কা'লা কা'মা ফীনা রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বি-খামসে কালেমাতিন"—পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করার জন্য নবী করীম (সাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করলেন। "ফা কালা ইন্নাল্লাহা আয্‌যা ও জাল্লা লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়াম্বাগীলাহু আইঁইনামা—তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ঘুমান না। নিদ্রাগমন তাঁর মর্যাদা সম্মত নয়। তাঁর জন্য শোভনীয় নয়।

"ইয়াখফিযুল কিস্‌তা ওয়া ইয়ারফাউহু"—তিনি বাটখারার দু'টি পাল্লাকে নীচুও করেন আর উঁচুও করেন।" "কিস্‌ত" মানে ন্যায়-বিচার বা ইনসাফ। বলা হয়েছে, বাট খাড়ার দু'টি পাল্লার কোনটি উঁচু হয়, কোনটি নিচু। ব্যাখ্যাকারকগণ বলেন, এখানে বুঝায় এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা কর্মের ওজন করেন। তিনিই ফয়সালা করেন, কার আমল হাল্কা এবং কার ভারী। কার আমল মর্যাদার যোগ্য এবং কার আমল রদ করার যোগ্য।

"ওয়া ইয়ারফাউ ইলাইহে আমালাল্লাইলে কাবলা আমলিন্নাহারে"—দিনের (বেলায় মানুষের) কাজ-কর্ম শুরু হবার পূর্বেই রাতকালীন কাজ-কর্মের হিসাব নিয়ে নেয়া হয়। অর্থাৎ জবাবদিহির বিষয়টি পুরাপরি না বুঝার দরুনই এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, কেবল পরকাল বা কিয়ামতদিবসেই হিসাব-নিকাশ (ও বিচার) অনুষ্ঠিত হবে। অথচ পূর্বেই হয়ে গিয়ে থাকবে। কেবল ফলাফল প্রকাশ করা হবে। হিসাব-নিকাশ তো দৈনন্দিন সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যেতে থাকে। হিসাব-নিকাশের ফলশ্রুতিতে আমাদের আত্মা হয়তো বা জাহান্নামী (সাব্যস্ত) হতে থাকে; নয়তো বা জান্নাতী। অতএব, "সারীউল-হিসাব" (ত্বরিৎ হিসাব-নিকাশকারী)-এর একটি অর্থ ইহাও যে, আল্লাহ্‌তা'লা সুদীর্ঘকালের হিসাবের অপেক্ষা করেন না, হিসাব ফেলে রাখেন না। বরং সাথে-সাথেই এক হিসাব-নিকাশের নেযাম বা ব্যবস্থা-ধারা সচল ও সক্রিয় আছে, যার দরুন মানবাত্মাতে সুপ্রভাব অথবা কুপ্রভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। প্রত্যেকের আমলের ফলাফল সৃষ্টি হতে থাকে। অতএব, বাট-খাড়ার দুই পাল্লায় ওজন করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ্ ফয়সালা করে থাকেন, যার ফলে মানুষের কোন আমল ওজনহীন (হাল্কা) এবং কোন আমল ভারী প্রতীয়মান হয়। এবং

তাঁর দিকে রাতের আমলকে দিনের আমল শুরু হবার পূর্বেই উঠানো হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক রাতের অবসানের পরে পরেই ঐ রাতে কৃত-কর্ম সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে যায় যে, ঐ সব কর্মের কী মূল্য ছিল এবং তাদের সাথে কী ব্যবহার হওয়া উচিত। তেমনিভাবে দিনের অবসানের পূর্বেই সে দিনের আমলের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করা হয়। এরপর, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: "হিজাবুহুন্ নূর"—আল্লাহ্‌র পর্দা বা আবরণ হচ্ছে নূর। অর্থাৎ মানুষের আবরণ তো হয়ে থাকে তার নূরকে ঢাকার বা লুকাবার জন্য। অচেৎ যারা (নিজেদেরকে) লুকাতে চায়, তারা যদি আবরণ ছাড়া থাকে, তা হলে উলঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ্‌তা'লা নিজেকে নূরের আবরণ দিয়ে (ঢেকে) রেখেছেন। অদ্ভুত রকমের বিষয়-বস্তু! মানুষে নূর আড়াল করার জন্যে আবরণ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা আবৃত রয়েছেন নূরের আবরণে! তাঁর পর্দাই হচ্ছে নূর। অতএব, আপনারা যে-দিকেই তাকাবেন, সে-দিকেই খোদার নূর পরিলক্ষিত হবে। ইহা সেই বিষয়-বস্তু, যা বিশ্ব-জগৎ ও উহার সব কিছুতে দৃষ্টিপাতে এক নূতন রঙ (দৃষ্টিভঙ্গী) সৃষ্টি করে।

বাস্তব সত্য এই যে, যে-দিকেই তাকিয়ে দেখুন না কেন, সে-দিকেই খোদার নূর দেখা যায়। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ নযমটি—যথা:

চান্দ্ কো কাল্ দেখ কার ম্যায় সাখ্‌ত বে-কল্ হোগিয়া!
কিঁউকেহ্ কুছ্ কুছ্ থা নিশাঁ উস্ মেঁ জামালে-ইয়ারকা॥

(চাঁদকে কাল দেখে আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লাম। কেননা, উহাতে ছিল বন্ধুর সৌন্দর্যের কিছু কিছু নিদর্শন)।

ইহা তিনি 'আবরণে'র দিকে ইশারা করছেন। তারপর সমস্ত নযমটি নূরেরই নযম এবং সবই আবরণ সম্পর্কীয় বিষয় কিন্তু এই আবরণ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উহা নূর, অথচ উহা আবরণ। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার নূর হচ্ছে এরূপ এক আবরণ, অথবা আল্লাহ্‌র আবরণ এরূপ এক নূর যা দেখে মনে হয় যেন আমরা আল্লাহ্‌কে দেখছি। অথচ উহা হয়ে থাকে নূর; খোদা না। কেননা, খোদাতা'লা রয়েছেন ঐ নূরের আবরণের পেছনে। অতএব, প্রতিটি জিনিষ, যা নূর স্বরূপ দেখা যায়, উহা হল এক পর্দা এবং যে পর্দা বা আবরণ যত বেশী স্বচ্ছ হবে তত বেশী উহার পেছনে খোদা পরিলক্ষিত হবেন। উক্ত অর্থ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পর্দা যেহেতু সবচে' বেশী স্বচ্ছ ছিল, সেহেতু বলা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌তা'লার নূরের 'মিসাল' (বা উপমা)। যদি খুব নিকটতর দেখতে হয়, তাহলে এই আবরণটিকে দেখ; এর মধ্যে দিয়ে খোদাতালার নূরের অধিকতর ঝলক পরিদৃষ্ট হবে। নচেৎ, অন্য যে-কোনও আবরণ, যা অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ, উহা এতো শান ও মর্যাদার সাথে ও যথার্থরূপে খোদার নূরকে প্রকাশ করতে পারে না।

অতঃপর, আঁ-হযরত (সাঃ) বলছেন, নূরের আবরণে খোদাতা'লা কেন নিজেকে আচ্ছাদিত করেছেন? —"লও কাশাফাহু লা-আহ্‌রাকাত সাবহাতু ওয়াজ্‌হেহি মান-তাহা ইলাইহে বাসারুহু মিন খালকিহি"—যদি খোদাতা'লা তাঁর নূরের পর্দা সরিয়ে দেন, তাহলে তাঁর চেহারার জ্যোতির্বিকাশ ও ঝিলিক দৃষ্টির শেষ প্রান্ত নাগাদ প্রতিটি সৃষ্ট জীব বা বস্তুকেই জ্বালিয়ে ছাই করে দিবে, নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তাঁকে (প্রত্যক্ষভাবে) দেখার কারও সাধ্য নেই। অতএব, এই আবরণ কেবল এরূপ পর্দা স্বরূপ নয় যে, কোন ব্যক্তি

যেমন তার প্রেমিককে দর্শন দান করতে চায় না। বস্তুতঃ ইহা ভিন্ন অর্থ বহন করে। ইহা এ অর্থ বহন করে যে, হে আমার প্রেমিক! আমি তোমাকে এতো ভালবাসি যে, তোমাকে আমি বিনাশ করতে চাই না। তোমাকে আমার নূর ও সত্তা ততটুকু দেখাবো, যতটুকু সইবার তোমার সামর্থ্য আছে। তার অতিরিক্ত দেখালে উহা তোমার উপরে যুলুম করা হবে। দর্শনকারীই কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে তূর পর্বতে যে ব্যবহার দেখানো হয়ে ছিল, উহা উক্ত বিষয়-বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। কোনও কার্পণ্যের প্রশ্ন ছিল না। খোদাতা'লা তো প্রত্যেককেই নিজের অস্তিত্বের দর্শন করাতে চান। কিন্তু তাঁর নূর বা সত্তা হচ্ছে আমাদের জন্যে এক দুর্বোধ্য জলওয়া, যেখানে আমাদের কল্পনাও পৌঁছুতে পারে না। "তার পর্দা জ্যোতির্ময়"—('হিজাবহুন নূর')-এর একটি অর্থ ইহাও যে, তাঁর পর্দা তো সর্বত্রই জ্বলজ্বল করছে। তাহলে কে জানে তিনি নিজে যে কীরূপ হবেন! যেখানে এবং যে-দিকেই তাকান না কেন সেখানেই এবং সে-দিকেই তাঁর জ্যোঃতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দৃষ্টিতে যদি নূর থাকে, তবেই কিনা বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতেও এতো নূর পরিলক্ষিত হয় যে, হযরত মাওউদ (আঃ) বলেন:

"প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মাঝে রেখেছ কত তুমি অপূর্বগুণ রাজি।
কে পাঠ করতে পারে উহাদের মাঝে নিহিত মহা রহস্যাবলী?

যখন ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র প্রতিটি অণু-পরমাণুতেও রহস্যাবলীর জগৎ নিহিত দেখা যায়, তখন কে আছে যে, এই সমগ্র বিশ্ব-জগতের রহস্যাবলীকে আয়ত্ব করতে পারে এবং সব-কিছুর দর্শন লাভে সক্ষম হয়?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন ঐ কথাগুলো বলেন, তখন পর্যন্ত এ্যাটমের শক্তি ও রহস্যাবলীর কোন কথাই মানুষ শুনে নি। বিষয়টির কোন কথা সাধারণ আলোচনায়ও আসে নি। কিন্তু যেহেতু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র নূরে (আলোকে) প্রত্যক্ষ করছিলেন, সেহেতু তিনি কুরআন করীমের নূর এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরের মাধ্যমে এ বাস্তব সত্যটিতে উপনীত হন যে, খোদাতা'লা যা-কিছুই সৃষ্টি করেছেন উহার অণুপরমাণু ও আল্লাহ্‌র নূর বিশেষ, যা কিনা খোদাতা'লার আবরণস্বরূপ। এবং আবরণ আবার নূর বিশেষ হওয়ার অর্থ এই যে, যিনি উহার পেছনে আছেন, তাঁর দ্বারা উহা আলোকিত হচ্ছে। উহা যত স্থূলই হোক না কেন, উহার পেছনে যিনি জ্যোতির্বিকাশে বিরাজমান আছেন এবং এতো শক্তি ও পরাক্রমের সাথে জ্যোতির্বিকাশে বিরাজমান যে, তাঁর চেহারার উপরে প্রতিটি আবরণই নূরে পরিণত হয়েছে। অতএব, এদিক দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন বিশ্ব-জগতকে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেন তখন স্বতঃস্ফূর্তরূপে বলেন: "কে পাঠ করতে পারে উহাদের মাঝে নিহিত মহা রহস্যাবলী।" এবং এই একই বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেছেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এই বলে যে, "হিজাবুহুন্ নূর"—নূর তো হচ্ছে তাঁর চেহারার (বা অস্তিত্বের) আবরণ। "লও কাশাফাহু"—যদি তিনি তাঁর চেহারা অনাবৃত করেন এবং দেখিয়ে দেন, "লা-আহরাকাত্ সাবহাতু ওয়াজহেহি মান্ তাহা ইলাইহে বাসারুহু মিন খালকিহি"—তাহলে তাঁর চেহারার জালাল ও প্রতাপ, উহার মহাজ্যোঃতি ও জালওয়া দৃষ্টির শেষ প্রান্ত অবধি সৃষ্ট-জীব ও বস্তুকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিবে। (ক্রমশঃ)

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ

ভাবান্তর : মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

(নবম কিস্তি)

হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর মৃত্যু ও মিশরের আলেমবৃন্দ

(১) আল্লামা রশীদ রেযা, প্রাক্তন মুফতী মিশর ও আল্ মানার পত্রিকার সম্পাদক المنار القول بهجرة المسيح الى الهند و موته فى بلدة سرينكر فى كشمير-

বিষয়ে লেখেন :

فغراره الى الهند و موته فى ذلك البلدة ليس ببعيد عقلا و نقلا" -

(رساله المنار جلد ٥ ص ٩٠٠-٩٠١)

বঙ্গানুবাদ : মসীহ (আঃ)-এর হিন্দুস্থানে যাওয়া এবং তাঁর ঐ শহরে (শ্রীনগর, কাশ্মীর) মৃত্যুবরণ করা জ্ঞান ও ইতিহাস থেকে দূরে নয় (আল্ মানার পত্রিকা : ৫ম খণ্ড ৯০০-৯০১ পৃষ্ঠা)

(২) আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 'আবদুহু :

তিনি ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর অর্থের সমর্থন করে লিখেন :

التوفى هو الا ماتة كما هو الظاهر المتبادر - (المنار)

অর্থাৎ, এখানে 'তাওয়াফ্ফী' শব্দের অর্থ মৃত্যু। আর প্রকাশ্য ও আপাত: দৃষ্টিতে অর্থ ইহাই। (আল্ মানার)

(৩) **আল-উস্তাদ মাহমুদ সালতুত :** প্রাক্তন মুফতী, মিশর ও রেক্টর আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, তাঁর ফাতাওয়া-এর মধ্যে মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে বিস্তারিতভাবে এর বিভিন্ন অংশের ওপরে আলোকপাত করেন এবং অতি স্পষ্টভাবে লেখেন যে, মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করা কোন ক্রমেই সিদ্ধ নয়। তিনি তাঁর আলোচনার শেষে লেখেন :

١- انه ليس فى القران الكريم ولا فى السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن اليها القلب بان عيسى رفع بجسده الى السماء و انه الى الان فيها -

٢- ان كل ما تفيد الآيات الواردة في هذا الشان هو وعد الله عيسى بانه متوفيه اجله ورافعه اليه وعاصمه من الذين كفروا وان هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله اعداءه ولم يصلبوه ولكن وفاه الله اجله ورفعه اليه -

(এ ফতওয়া সর্বপ্রথম 'আর্ রেসালাহ্'-এর ১৯৪২ সনের ১০ই মে-এর ১ম খণ্ড, ৬৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পরে 'আল্ ফাতাওয়া' নামে মযমুয়া ফাতাওয়া আল্লামা সালতুত-এর মধ্যে আল্ এদারাতুল 'আম্মাতুলিল সাকাফাতুল ইসলামীয়া বিল আযহার-এর পরিচালনায় প্রকাশিত হয়)।

বঙ্গানুবাদ : (১) কুরআন করীম ও পবিত্র সুন্নত-এর মধ্যে কোন এমন নির্ভরযোগ্য সুপ্রকাশিত আদেশ নেই যা কিনা এ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করতে পারে এবং যার দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে, ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তিনি এখন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করছেন।

(২) এ প্রসঙ্গে যতগুলো আয়াত (কুরআন করীমের) আনা হয় সেগুলোর সুবিধা কেবল এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার ঈসা (আঃ)-এর সাথে অঙ্গীকার ছিলো যে, তিনি নিজে তাকে বয়স পুরো করার পরে মৃত্যু দিবেন এবং তার আত্মিক উদ্ধরণ করবেন এবং তার অস্বীকারকারীগণের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আর এ অঙ্গীকার পূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন, তার শত্রুরা না তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে আর না ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পেরেছে বরং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর নির্ধারিত বয়সসীমা পূর্ণ করেছেন এবং পরে তাকে তাঁর দিকে আত্মিকভাবে উদ্ধরণ করেছেন।

টীকা : এই ফতওয়া ব্যতিরেকে উল্লেখিত আল্লামা মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু ও রাফা'আ সম্বন্ধে একটি বিরাট প্রবন্ধ আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা মুজাল্লাতুল আযহার-এর ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সনের সংখ্যার ইংরেজী অংশে The Ascension of Jesus শিরোনামে প্রকাশ করিয়েছেন যার অনুবাদ নাযারতে ইসলাহ ও ইরশাদ 'রাফা'আ ঈসা' নামে প্রকাশ করেছেন।

(৪) **আল্ উস্তাদ আহমদ আল্ আজুর** তাঁর একটি পত্রে লিখেছেন যার ফটো কপি আমার নিকট মজুদ আছে :

ان السيد المسيح قد مات في الارض حسب قول الله تعالى اني متوفيك اي مميتك والموت امر كائن لا محالة اذ قال الله ان السانه والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت"

বঙ্গানুবাদ ঃ সৈয়্যদনা মসীহ্ পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লার উক্তি "ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা" অনুযায়ী (আর এর অর্থ) এই যে, আমি তোমাকে মৃত্যুদানকারী আর মৃত্যু তো প্রকৃতপক্ষে হবারই বিষয়। যখন কিনা আল্লাহ্‌তা'লা মসীহ্ (আ:)-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, শান্তি হোক আমার ওপরে যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করবো।

(৫) **আল্ উস্তাদ মুস্তাফা মারাগী** তাঁর তফসীরে আলোচ্য আয়াত "ইয়া 'ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্‌ফীকা-এর ওপরে লেখেন :

"وفى هذا بشارة بنجاته من مكرهم وابتغاء اجله وانهم لاينالون منه ما كانوا يريدون بمكرهم وخبثهم وان التوفى هو الاماتة العادية وان الرفع بعده للروح والمعنى انى مميتك وجاعلك بعد الموت فى مكان رفيع عندى كما قال فى ادريس عليه السلام 'ورفعناه مكانا عليا' -"

(تفسير المراغى الجزء الثالث ص ١٦٥)

বঙ্গানুবাদ ঃ এই আয়াতে এ বিষয়ের সুসংবাদ রয়েছে যে, মসীহ্ (আ:) (স্বীয় শত্রুদের) নানা প্রকার হীন কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পাবেন। আর স্বীয় বয়সসীমা পূর্ণ করবেন এবং আরও এই যে, তার শত্রুগণ নিজেদের দুষ্ট ও হীন কার্যকলাপের ক্ষমতা দ্বারা যা লাভ করতে চেয়েছিলো তাতে তারা সফলতা লাভ করবে না। আর 'তাওয়াফ্‌ফা' দ্বারা দৈনন্দীন মৃত্যু বুঝায় এবং রাফা'আ মৃত্যুর পরে আত্মার জন্যে নির্ধারিত। তাহলে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো এবং মৃত্যুর পরে তোমাকে নিজ সন্নিধানে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবো যেভাবে ইদরীস (আ:) প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে যে, ওয়া রাফা'আনাহু মাকানান 'আলীয়্যা অর্থাৎ আমরা ইদরীসকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

(তফসীরুল মারাগী, ৩য় অধ্যায়, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

(৬) **আল্ উস্তাদ আবদুল করীম আশ্ শরীফ** লেখেন :

"والمسيح عليه السلام طبعا كما يذكر القرآن قدتوفاه الله ورفعه اليه وطهره مثل ما يتوفانا ويرفعنا اليه" - (النفحة من التاويل)

বঙ্গানুবাদ ঃ আর মসীহ্ (আ:)ও স্বাভাবিকভাবে, যেভাবে কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ্‌তালা তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং পরে তাকে নিজের দিকে আত্মিক উদ্ধরণ করেছেন এবং তাকে পবিত্র করেছেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন ও তার দিকে আমাদেরকে উঠিয়ে নেন। (আন্‌নাফহাতু মিনাত্ তাবীল)

(৭) **আল-উস্তাদ আবদুল ওয়াহাব আন্নাজ্জার :** হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন চরিতে কুরআন করীমের এ আয়াতে —ওয়া কুনতু 'আলায়হিম শাহিদাম্মাদুম্‌তু ফিহিম ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী—এর উল্লেখ করে লেখেন :

و انه كان يرى اقوامه و يسدد هم بالنصائح الى و فاته و بعد ذلك كان الله رقيبهم -
(قصص الانبياء ايديشن چهارم ص ۱۹۵۶)

বঙ্গানুবাদ : আর মসীহ্ (আঃ) স্বীয় মৃত্যু পর্যন্ত তার জাতিকে পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন এবং উপদেশের মাধ্যমে আমরণ তাদেরকে সঠিক পথে চালাতে ছিলেন। এর পরে আল্লাহ্ তা'লা ঐসব লোকের ওপরে পর্যবেক্ষক ছিলেন।

(কাসাসুল আম্বিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ)

(৮) **ডাক্তার আহমদ যাকী আবু শাদী** আর্জেন্টিনার বিখ্যাত আরবী পত্রিকা 'আল্ মুওয়াহেব'-এর মধ্যে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ "হাল আল কুরআন মু'জেযাহ্'-এর মধ্যে লেখেন :

والاسلام يعرف ان الله فى كل مكان و انه نور السماء والارض فعبارة "رفعه الله اليه" ليست بمعنا ها المادى اى رفعه الى السماء حسب تفكير المسيحيين ......فا لرفع هنا بمعنى الاخذ و التكريم خفية بعكس حقارة الموت صلبا كما يقتل المجرمون و التفسير الاخرى التى اخذ بها بعض شراح المسلمين هى اقرب الى التفاسير الشعرية منها الى المنطق السليم لان ثقا هة اصحا بها العلمية محدودة (المواهب ص ۱۹۵۵ ع)

বঙ্গানুবাদ : ইসলামের সুপরিচিত ধর্মীয় বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই আছেন এবং আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ। অতএব রাফা'আহুল্লাহু ইলায়হে স্বীয় ভৌত অর্থে নয় যে, আল্লাহ্ মসীহ্ (আঃ)-কে খৃষ্টানদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন……বরং রাফা'আ অর্থ এখানে রক্ষা করা এবং লাঞ্ছনাজনক ক্রুশীয় মৃত্যুর মোকাবেলায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা। এ রকম মৃত্যু অপরাধীগণকে দেয়া হয়ে থাকে।

আর রয়েছে অন্যান্য তফসীর যেগুলো কতক মুসলমান তফসীরকারগণ প্রনয়ন করেছেন। তারা যুক্তি-ভিত্তিক তফসীর করার পরিবর্তে কাব্যিক তফসীরাদি প্রনয়ন করেছেন আর এসব তফসীর জ্ঞানের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে খুবই সীমাবদ্ধ। (চলবে)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

বাঁধনহারা জীবনের ফসল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দৈনিক পত্রিকা ভোরের কাগজে ৭ ফেব্রুয়ারী (৯৬) তারিখে আমেরিকা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তিন কলাম ব্যাপী এর হেড লাইন হলো: 'আপন সন্তানের ভয়ে ভীত এক জাতিতে পরিণত হচ্ছে মার্কিনিরা'। তৎপর সংক্ষিপ্তসারে বলা হয়েছে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে শিশু-কিশোর অপরাধীর সংখ্যা'। তারুণ্যে বল্গাহীন উদ্দাম পুরো সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। 'মার্কিনিরা এখন এমন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে যারা নিজেদের সন্তানের হাত থেকেও নিরাপদ নয়।' এই ফিচারটি 'সানডে টাইমস্' অবলম্বনে লিখেছেন শাহানা হুদা।

প্রায় তিন কলমের প্রতিবেদনে একটি ছবি দেয়া হয়েছে যার নীচে লেখা আছে: পাঁচ বছরের এরিকের মৃত দেহ। তাকে মেরে ফেলে ১০ ও ১১ বছরের অন্য দু'জন শিশু। প্রতিবেদনে বহু তথ্য এবং বেশ কিছু সংখ্যক পরিসংখ্যান রয়েছে। এখানে ওসব হতে উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য রাখছি। স্বপ্নের দেশ আমেরিকাতে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা শিশু-কিশোরদের ভিতর অপরাধপ্রবণতা নিয়ে অসম্ভব ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কারণ সে দেশের প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার ছাত্র প্রতিদিন স্কুলে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে। তারা এটাকে একটা 'নতুন কিছু করা বলে মনে করে।'

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে টিনএজ [১৩-১৯] সহিংসতার হার এতোটাই বেড়েছে যে, তারা আইন করেছে ১৪ বছর বয়সীদের প্যারোল ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যাবে।' 'তাদের তারুণ্যের জোয়ারে তারা সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করছে। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক গ্রহণ ও পাচারকে তারা অপরাধ হিসেবে দেখছে না।'

'জন ডিপুলিও (অপরাধ বিশেষজ্ঞ) এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।.....তবে অনেকেই তার মত মেনে নেয় নি। তারুণ্যের বল্গাহীন উদ্দাম-উচ্ছ্বাস ও স্বাধীনতা আমেরিকাকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। শিকাগোর একজন আইনজীবীকে তাই দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনি, আমরা এমন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছি, যারা নিজেদের শিশুদের দ্বারা ভীত হয়ে আছি।'

এক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয় অতীব গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। মানুষ কখনও অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে না। তাকে যুক্তি, সামাজিক বিধি-বিধান ও আদর্শের

নিয়ন্ত্রণ মানতেই হবে। মানুষ পশু হতে বহু ফায়দা উঠায়। ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখেই তা সম্ভবপর হয়। অথচ সে বুঝতে চায় না যে, নিজের অন্তর্নিহিত 'পশুত্বকে' লাগামহীন ছেড়ে দিয়ে মনুষ্যত্বকে পরিপুষ্ট করা যায় না। কেন তারা বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে তা তলিয়ে দেখা অত্যাবশ্যক। ছোটরা খুবই অনুকরণ প্রিয়। তাই বড়রা যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়, মন যখন যা চায় তা করে চলে, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে বোঝা মনে করে, সেকেলে বলে বিচার-বিবেচনা না করেই উড়িয়ে দেয়, সৎজীবন যাপনে অভ্যস্থ না হয় তবে ছোটদের ঐ পথ ধরা সহজতর হয়। তারুণ্যের জোয়ারে তারা ভেসে যায়। প্রাচুর্যের আমেরিকাতে তা ঘটছে, অন্যান্য দেশেও ওসব ছড়াচ্ছে। চরম দারিদ্র যেমন, আদর্শহীন অঢেল প্রাচুর্যও তেমনি নৈতিক মান উন্নত করতে পারে না। তা ছাড়া অশ্লীল বই পুস্তকের ছড়াছড়ি, সিনেমা, নাটকাদিতে কথায় কথায় মারামারি হুড়াহুড়ির চূড়ান্ত পর্যায় দেখিয়ে ছোটদেরকে পুষ্পের মত নির্মল-নিষ্পাপ করা যায় না তা বুঝেও না বুঝলে যা হবার তা-ই অবাধে হয়ে যাচ্ছে।

ছোটদের ভাল করে গড়তে হলে বড়দেরকে ভাল হতে হবে যাতে তারা অনুকরণ অনুসরণের প্রচুর উপাদান পায়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নিষ্ঠার সাথে নিখাদ আদর্শের বাস্তবায়ন। তা হতে হবে জীবনের সর্বস্তরে।

খৃষ্টান বিশ্বকে একটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে বলবো। একের পাপের বোঝা অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বহনের জন্যে স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন, এজন্যে তিনি শূলে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এমনকি প্রজন্মের পাপের বোঝাও অগ্রিম বহন করার নিশ্চয়তা যে পাপের 'মেইন গেট' খুলে দেয় এই সহজ সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ বিশ্বাস ও মানসিকতা পরকালে স্বর্গের পথ প্রশস্ত করবে কিনা এ প্রশ্ন বাদ দিলেও ইহজগতকে যে দোযখে পরিণত করছে উপরোক্ত প্রতিবেদনটি তো সে কথারই সাক্ষ্য বহন করছে।

কালামুল ইমাম

"জগতের অভিশাপকে ভয় করিও না, কারণ উহা দেখিতে দেখিতে ধুঁয়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। উহা দিনকে রাত করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর নিপতিত হয়, তাহার উভয় জগতকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে না; কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের পাতাল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমরা সোজা, সরল, পবিত্র ও নির্মলচিত্ত হইয়া যাও"। (হযরত ইমাম মাহদী (আঃ): কিশ্‌তিয়ে নূহ, ২৩ পৃষ্ঠা)

পত্র-পত্রিকা থেকে

ডায়াবেটিস ঃ সচেনতাই প্রধান নিয়ন্ত্রক

"দেশে এখন ত্রিশ লাখ লোক বিভিন্ন মাত্রার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। মূলতঃ অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের কারণে এ সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। অথচ, ডায়াবেটিক সমিতি ৩২টি শাখার মাধ্যমে মাত্র ১০ শতাংশ রোগীকেই শুধু চিকিৎসা-সুবিধা দিতে পারছে।

উল্লেখ্য, এই রোগ মানুষের অন্তিম দিনেরও সঙ্গী। চিকিৎসার আধুনিক ব্যবস্থা এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে বলে একজন ডায়াবেটিস রোগী স্বাভাবিকভাবে তার কর্মজীবন নির্বাহ করতে পারেন। ডায়বেটিস রোগীদের এই বরাভয় শোনানোর জন্যই মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম বারডেম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র সেন্টার অভ এক্সেল্যান্স। বহুমুত্র বা মধুমেহ রোগের চিকিৎসার জন্য এখানে এখন প্রাণীজ ইনসুলিনের মধ্যে মানবদেহের ইনসুলিনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু, এ মুহূর্তের অন্যতম করণীয় হচ্ছে, দেশে তালিকাবহির্ভূত প্রায় বাইশ লাখ ডায়াবেটিস রোগীকে সচেতন করে তোলা যাতে কেউ বিনা চিকিৎসায় বা অজ্ঞতায় মৃত্যুবরণ না করে। অনেকেই স্মরণ রাখতে চান যে, ডায়াবেটিস নিজে তত প্রকট ব্যাধি না হলেও অনেক মারাত্মক রোগের জননী। সচেতনতার অভাবে ডায়াবেটিস জন্ম দিতে পারে পক্ষাঘাত হৃদরোগ, যক্ষ্মা, মাড়ির প্রদাহ, অন্ধত্ব, মূত্রাশয়ের রোগ ও গর্ভকালীন জটিলতা।

ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে গণমাধ্যম। এছাড়াও সরকারী পর্যায়ে প্রতিটি জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল হাসপাতালগুলো পৃথক ডায়াবেটিস বিভাগ খুলে সবার জন্য এই রোগের চিকিৎসা সহজতর করে তুলতে পারে। এ কাজে যত দ্রুত সাফল্য আসবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গল। তথ্য বিবরণী"।

(২৮-২-৯৬ তারিখের দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)

(৩৪ পষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

এবং এ জামাযা অনুষ্ঠান এম, টি, এ কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর ফযলে তার শূণ্যস্থান পূরণ করুন।

ক্যানাডায় 'রেডিও আহমদীয়া'-র উদ্বোধন ঃ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী ক্যানাডার টরেন্টো শহর হতে 'রেডিও আহমদীয়া'র প্রচার কার্য শুরু হয়েছে। এ সেন্টার হতে প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার ক্যানাডার সময় রাত ১0 টায় এক ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

রমযানের দরসে কুরআন ঃ

জুমআ ব্যতীত প্রত্যেকদিন কুরআনের দরস বিকাল ৫-৩০ হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এ পক্ষকালে হুযূর (আইঃ) সূরা নিসার ৬ হতে ১৬ বা ১৭ আয়াত পর্যন্ত তফসীর প্রদান করেন। এতীমদের প্রতিপালনকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য একটি 'কোর্ট অভ ওয়ার্ডস' (Court of wards)-এর প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে হুযূর (আইঃ) মত প্রকাশ করেন।

লণ্ডন থেকে জানা গেছে যে, এ মাসের (মার্চ-৯৬) শেষ দিকে এম, টি, এ ২৪ ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচার করতে যাচ্ছে।

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬)

সংকলন—আবদুল্লাহ শামস্ বিন তারিক

ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা ঃ

১৯৯৬ সনের প্রথম খুৎবায় হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ২৬৮ ও ২৬৯ নং আয়াতের আলোকে মালী কুরবানীর উপরে আলোচনার পর ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা প্রদান করেন। ১৯৯৫ সালের প্রাপ্ত ৭৩টি দেশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাজেট ছিল ৫,৭৭,৭২৬ পাউণ্ড এবং আদায় ৬,৭০,৯০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আদায় বাজেটের চেয়েও শতকরা ২৭ ভাগ বেশী। চাঁদার দিক থেকে প্রথম স্থান পাকিস্তানের এবং তারপরে জার্মানী, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম ও জাপান জামাত। হুযূর (আইঃ) এই চাঁদা যত অল্প পরিমাণেই হোক না কেন এতে নতুন আহমদীদের শামিল করার নির্দেশ দেন।

ঘানার অতিথিদের সাথে 'মুলাকাত' ঃ

৭ই জানুয়ারীর 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে ঘানার অতিথিরা উপস্থিত থেকে প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন। আহমদী ছাড়াও এক ক্যাথলিক খৃষ্টান দম্পতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদি করেন।

কাযাখস্থানের অতিথিদের সাথে প্রশ্নোত্তর সভা ঃ

৬ই জানুয়ারী একটি আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর সভায় হুযূর (আইঃ)-কে কাযাখস্থানের অতিথিগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। অনুবাদকের দায়িত্ব সম্পাদন করেন রাশিয়ার তাতারস্তানের বিশিষ্ট আহমদী জনাব রাভীল বুখারী।

হোমিওপ্যাথিক গবেষণার আহ্বান ঃ

হোমিও ঔষধ মানব দেহের কোন্ পর্যায় (level) পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে তার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হুযূর (আইঃ) নির্দেশ দেন। উদাহরণস্বরূপ হুযূর (আইঃ) বলেন যে, ডিপথেরিনাম ২০০ প্রতিষেধক হিসাবে কয়েক দিন এবং এরপর সপ্তাহে ২/১ দিন করে কয়েক সপ্তাহ খেলে দশ বছর পর্যন্ত ডিপথেরিয়ার ভয় থাকে না। এমনকি বিড়ালের ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট খেলেও কোন ভয় নেই। সুতরাং নিশ্চয় এই ঔষধ Immune System পর্যন্ত প্রভাব ফেলে। আবার অনেক সময় জন্মগত ত্রুটি যেমন বামনত্ব দূর করা সম্ভব হয়। এজন্য ঔষধ দেয়ার পূর্বে এবং পরে পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরে ঠিক কি পরিবর্তন হচ্ছে তা আধুনিক পদ্ধতিতে হুযূর (আইঃ) গবেষণার আহ্বান জানান।

এ প্রসঙ্গে হুযুর (আইঃ) বিশেষভাবে একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রাণ-রসায়নবিদ (Biochemist)-এর গবেষণার উল্লেখ করেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পর এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে তুমুল আলোড়ণ সৃষ্টি হয়।

তরজমাতুল কুরআন ক্লাস ঃ

তরজমাতুল কুরআন ক্লাসের ধারায় হুযুর (আইঃ) ১০ই জানুয়ারীর ক্লাসে সূরা তওবা শেষ করে সূরা ইউনুসের তরজমা শুরু করেন।

জুমুআর খোৎবাসমূহে রমযান ও অন্যান্য বিষয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ বক্তব্য ঃ

১২ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ এর খোৎবায় হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ধারা-এর বিষয় অব্যাহত রাখেন। বিশেষভাবে 'নূর' এবং 'সালাম' এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে হুযুর (আইঃ) আলোচনা করেন। হুযুর (আইঃ) আসন্ন রমযানে আমাদের জন্য 'সালামতি'-এর সংবাদের জন্য দোয়া করেন এবং সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করেন।

১৯শে জানুয়ারী ছিল রমযানের পূর্বে শেষ জুমুআ। এজন্য হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৮৪-৮৭ আয়াতের আলোকে রমযান সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশের জামা'তের ওপরে দায়িত্ব দেন যেন তারা নিজ নিজ দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী (astronomer)-দের নিকট হতে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পূর্বেই রমযান সম্পর্কে ঘোষণার ব্যবস্থা করেন। সফরে এবং অসুস্থ অবস্থায় রোযা না রেখে পরবর্তীতে সেটি পূরণ করার যে নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা হুযুর (আইঃ) স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ দেন সেভাবে পালন করাই নেকী এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ না করার অর্থ হল জোর করে আল্লাহ্‌কে খুশী করার চেষ্টা করা।

এর পরের খোৎবা ছিল রমযানের প্রথম খুৎবা। ২৬ তারিখের এই খোৎবায় হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন যে, এটিকে এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারে যে, রমযান হল সেই মাস 'যার সম্পর্কে' কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, রমযান মু'মিনদেরকে নেকীর দিকে অগ্রসর করে এবং পাপ হতে দূরে সরিয়ে নেয়। এ অর্থে রমযানে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয় যার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে রমযানে বেহেশ্‌তের দরজা উন্মুক্ত দোযখের দরজা বন্ধ, শয়তানের বন্দী হওয়া প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, শয়তান সকলের জন্যে বন্দী হলে তো রমযানে সকল মন্দ কাজ বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। তাই এক্ষেত্রে নেক ব্যক্তির নফ্‌সের শয়তানের উপর নিয়ন্ত্রণের কথাই বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজ নফ্‌সের প্রবৃত্তিগুলোকে বন্দী করে ফেলে তার জন্য

রমযান এ সকল কল্যাণ বয়ে আনে। এজন্যই হাদীসে এ দুনিয়াকে মু'মিনদের জন্য কারাগার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শেষাংশে হুযুর (আইঃ) বলেন যে, রমযানে সালামতির পয়গামের জন্য আমরা দো'য়া করছিলাম। এদিকে এম, টি, এ-র জন্য একটি অত্যন্ত উচু মানের 'গ্লোবাল বীম' (global beam), যা অর্ধেক পৃথিবীতে দেখা যায়, এর জন্য চেষ্টা চলছিল। এজন্য একটি আইনগত কারণে পঁয়তাল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক ছিল। এদিনগুলো যে কীরূপ উদ্বেগ ও দোয়ার মধ্য দিয়ে কেটেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। আল্লাহ্‌র ফযলে ১লা রমযানের সন্ধ্যায় এ সুসংবাদ আসে যে, এটি ইনশাল্লাহ্‌ আমরা পাব। এতে ২৪ ঘন্টা বা তার কিছু কম সময়ের জন্য এম, টি, এর সম্প্রচারের ব্যবস্থা সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ্‌।

রমযানের দরসে কুরআনে খৃষ্টীয় অপবাদসমূহ খণ্ডন ঃ

পবিত্র রমযান উপলক্ষ্যে জুম'আ ব্যতীত প্রত্যেক দিন হুযূর (আইঃ) কুরআনের বিশদ ও গভীর তফসীর প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৫-৩০ হতে রাত ৭টা পর্যন্ত এ দরস অনুষ্ঠান লণ্ডনের মসজিদে ফযল হতে এম, টি, এ-র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ২২শে জানুয়ারী হতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত হুযুর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের শেষ দুই আয়াত এবং সূরা নিসার প্রথম পাঁচ আয়াতের তফসীর প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, কোন কোন আয়াতের তফসীরে হুযুর (আইঃ) তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত সময় দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং একাধিক বিবাহের অনুমতি সম্পর্কে খৃষ্টান ও পাশ্চাত্য সমাজের অপবাদের উত্তর দিতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বহু তফসীর, অভিধান, খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল এবং খৃষ্টান মনীষীদের লেখা হতে উদ্ধৃতি পেশ করেন। তিনি বলেন যে, বাইবেলে নারীজাতিকে শুরু থেকেই পাপের উৎস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, শয়তান প্রথমে 'হাওয়া'কে প্রলুব্ধ করে এবং তার প্ররোচনাতেই 'আদম' সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে পাপী হয়ে পড়ে (আদি পুস্তক ঃ অধ্যায় ৩)। অপর পক্ষে সূরা নিসায় বলা হচ্ছে যে, মানুষকে প্রথমে এক 'নাফ্‌সেন ওয়াহেদাতেন' (একক সত্তা) হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভুলবশতঃ অনেকেই এই একক সত্তাকে 'আদম' মনে করে। কিন্তু কুরআনে সেই একক সত্তার ক্ষেত্রে 'খালাকা মিনহা যওজাহা' আয়াতাংশে 'হা' সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। 'ওয়াহেদাতেন' শব্দটিও স্ত্রী-বাচক। এভাবে স্ত্রী জাতিকে মানব সৃষ্টির আদি উৎস হিসাবে তার যথাযথ মর্যাদা দান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, প্রথম মানুষ ছিল নারী।

একাধিক বিবাহের অনুমতির ব্যাখ্যায় হুযুর (আইঃ) বলেন যে, কিছু এমন অবস্থা আছে (যেমন যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থায় এতীমদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে) যখন এরূপ ব্যবস্থা

অপরিহার্য। হুযুর (আইঃ) আরো বলেন যে, বাইবেলে বহু বিবাহের ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। একে নিন্দা বা নিষিদ্ধ না করে উল্লেখ করার মাধ্যমে স্বীকৃতিই দেয়া হয়েছে। ইসলামেই বরং এর সীমা চারজন পর্যন্ত বেঁধে দেয়া হয়েছে। মহিলাদেরও কেন একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি এ অভিযোগের উত্তরে হুযুর (আইঃ) বলেন যে, যদি উভয়কেই অনুমতি দেয়া হতো তবে এক স্বামীর চার স্ত্রী, প্রত্যেক স্ত্রীরই আবার আরও তিনজন চারজন করে স্বামী হলে এরূপ ধারায় এক বিশাল জটিলতার সৃষ্টি হতো। এছাড়া সন্তানের পিতৃত্ব নিয়েও সমস্যার উদ্ভব হতো।

এ প্রসঙ্গে হুযুর (আইঃ) আরো বলেন যে, ইসলামে একাধিক বিবাহের তাগিদ দেয়া হয়নি, কেবল বিশেষ অবস্থায় অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁর পিতা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর একেক সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী ছিল। কেননা, তখনকার অবস্থা সেরূপ দাবী করত, কিন্তু তাঁর তেরজন সাহেবযাদার কারো একসময়ে একাধিক স্ত্রী ছিল না।

রাবওয়ার অন্ধ আহমদীদের অনুষ্ঠান :

১৪ই জানুয়ারী একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান এম, টি, এ-তে দেখানো হয়। এতে রাবওয়ার 'মজলিসে নাবীনা' (অন্ধ ব্যক্তিদের সংগঠন)-এর এক ইজতেমা বা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান দেখানো হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাফেযে কুরআন ছিলেন।

'মুলাকাত'-এ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান ঃ

১৪ ও ২১শে জানুয়ারীর 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে হুযুর (আইঃ) যথাক্রমে সিয়েরালিওন ও ইংল্যাণ্ডের অতিথিদের সাথে মিলিত হন ও তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দেন। একটি ভিন্নধর্মী প্রশ্ন করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের মিঃ কলীম এড ওয়ার্ডস। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বব্যাপী অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে সি, আই, এ (মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা) ও অন্যান্য বড় বড় রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? হুযুর (আইঃ) বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সরাসরি আমাদের কাজে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে ততক্ষণ তাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, আমাদের পিছনে অপব্যয় করার মত অর্থ ও সময় তাদের থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পিছনে অপব্যয় করার মত অর্থ বা সময় কোনটাই আমাদের নেই।

হোমিওপ্যাথি ক্লাসে টনসিলের চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ ঃ

১৬ই জানুয়ারীর হোমিওপ্যাথি ক্লাসে হুযুর (আইঃ) টনসিলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করেন। হুযুর (আইঃ) দৈনিক দুই তিনবার বাইওকেমিক ফেরাম ফস, সাইলিশিয়া, নেট্রাম মিউর, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর একত্রে সেবনের পরামর্শ দেন।

ছোটদের ক্লাসে সেহরী সম্পর্কে আলোচনা ঃ

রমযানের পূর্বে ছোটদের ক্লাসে হুযুর (আইঃ) সেহরীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। হুযুর (আইঃ) বলেন যে, সেহরীর উদ্দেশ্য কেবল খাওয়া নয় বরং তাহাজ্জুদের

জন্যে রাত্রে জাগ্রত হওয়ার অভ্যেস সৃষ্টি করা। এজন্য সকলকে সেহরীর সময় দু-চার রাকাত নফল নামাযের জন্য হুযুর (আইঃ) তাগিদ দেন।

জুমুআর খুৎবায় রমযানের কল্যাণসমূহের উপর আলোকপাত ঃ

২রা ফেব্রুয়ারীর খুৎবায় সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হুযুর (আইঃ) বলেন যে, যখন বান্দার অন্তরে তার খোদা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয় এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিতে থাকে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে নৈকট্য দান করেন এবং তার আহ্বানে সাড়া দেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৮৪ ও ১৮৫ নং আয়াত তেলাওয়াতের পর বলেন যে, আমরা এখন রমযানের শেষার্ধে এসে পড়েছি। কুরআনে রমযানকে 'আইয়্যামাম্ মা'দুদাত' (নির্দিষ্ট বা গোণা কয়েকটি দিন) বলা হয়েছে। এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঈমানের ব্যক্তি যারা রমযানকে কষ্টদায়ক মনে করে তাদেরকে যেন আদরের সাথে ডাকা হচ্ছে যে, "হাতে গোণা কয়েকটিই তো দিন, এদিনগুলো আল্লাহ্‌র খাতিরে একটু কষ্ট করো।"

হুযুর (আইঃ) আরো বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তো আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত ছিল। তদুপরি রমযানে তার নেকীসমূহে এক নতুন শান ও মর্যাদার সৃষ্টি হত। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের রমযানের হিসাব নেয়া।

এম, টি, এ-র বিশিষ্ট অনুবাদকের তিরোধান ঃ

অত্যন্ত বেদনার সাথে জানানো যাচ্ছে যে, এম, টি, এ-র বহুল আলোচিত অনুষ্ঠান 'লেকা মা'আল আরব'-এ হুযুর (আইঃ)-এর বক্তব্য ও প্রশ্নের উত্তরসমূহের আরবী অনুবাদক, মিশরের বিশিষ্ট আহমদী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আল-হিল্‌মী আশ্‌শাফী সাহেব আর দুনিয়াতে নেই (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মিশরে কিছুদিন সফরের পর লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি হুযুর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর পরই লণ্ডনের মসজিদে ফযলেই তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং মৃত ঘোষণা করা হয়।

হিলমী শাফী সাহেব ১৯৬০ সালে সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তাঁর বন্ধু আরেকজন বিশিষ্ট মিশরীয় আহমদী মোস্তফা সাবেত সাহেবের তবলীগে বয়আত করেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন প্রকৌশলী। অবসর গ্রহণের পর হুযুর (আইঃ) তাঁকে লণ্ডন হতে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত আরবী পত্রিকা 'আল্-তাকওয়া' এর সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। এম, টি, এ, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরবদের নিকট তবলীগের দ্বার উন্মুক্ত হলে 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে তিনি হুযুর (আইঃ)-এর অনুবাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। তাঁর অনুবাদ এত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ছিল যে, এ অনুষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যেই আরবদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে এবং দৈনিক প্রচারিত হতে থাকে। এছাড়াও তিনি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী বইয়ের উপর অনুষ্ঠানসহ আরবদের জন্যে বিশাল খেদমতের তৌফীক লাভ করেন।

হুযুর (আইঃ) রমযানের দরসের অনুষ্ঠানে তার ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। ১৪ই জানুয়ারী তাঁর জানাযা হুযুর (আইঃ) পড়ান

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের আবির্ভাব

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

কবে এবং কখন মানুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হল তা সসীম মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ অনুমান করে, তিন লক্ষ বৎসর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। (Civilization, Past and Present, Vol, 1 Page, 35) অধুনা আবিষ্কৃত fossil বা জীবাশ্মগুলির উপর নির্ভর করেই এই অনুমান জাভা মানুষ পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বের, পিকিং মানুষ তিন লক্ষ ষাট হাজার এবং টাংগানাইকায় প্রাপ্ত ফসিল চার লক্ষ বৎসর পূর্বের বলে অনুমান করা হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে এক সময়ে পৃথিবী জলবাষ্পপিণ্ড ছিল। তাতে অনু বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। এইসব অনুরাশি ক্রমে পরস্পর মিলিত হয়ে অণুগুচ্ছের সৃষ্টি হল। ধীরে ধীরে ভাইরাস, বেকটেরিয়া, এমিবা, মোটাটিয়ান, সেপিয়ান প্রভৃতি জীবাণুর জন্ম হল। ক্রমে ক্রমে তা পনিরের মত কোমল অস্থিবিহীন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটাল। তারপর স্থাবর বনস্পতি এবং পরে জঙ্গম প্রাণীর উদ্ভব হল। কেউ বা জঙ্গলে কেউ বা স্থলে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে লাগল। বিবর্তনকে লেটিনে বলে Evolution অর্থাৎ ভাঁজ খোলা। কুরআন বলে, আকাশমণ্ডলী আদিতে ধূম্রময় (গ্যাস) ছিল (ফুচ্ছিলাত, ১২ আয়াত)। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী প্রথমে সম্মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন ছিল। অর্থাৎ সৌরজগৎ একত্রিত ছিল পরে পৃথক হয়ে যায় (আম্বিয়া ৩৬ আয়াত)। স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি হয়েছে (মুলক ৪ আয়াত)। উল্লেখ্য যে, আরবীতে আকাশকে বলা হয় সামা। সামা অর্থ উপরে যা থাকে, মহাশূন্য (লেন)। অপরদিকে আরবীতে সাত সংখ্যাটি বহু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সপ্তাকাশ দ্বারা মহাশূন্যের অসংখ্য স্তরের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআনের মতে পৃথিবী দুই ইয়াওমে সৃষ্টি হয়েছে, তাছাড়া আকাশমালাও দু'টি পৃথক ইয়াওমে সৃষ্টি হয়েছে (হামিম সেজদা ১১,১৩ আয়াত)। ইয়াওম বলতে কালের একটি ভাগকে বুঝায়। যা দিনের একটি ক্ষুদ্র অংশ থেকে শুরু করে সময়ের যে কোন এক বিরাট অধ্যায়কেও বুঝাতে পারে (মুফরাদাত, ৫৮২ পৃঃ)। আল্লাহ্ রাত্র দিন, সূর্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এসব স্ব স্ব পরিমণ্ডলে সাঁতার কেটে চলেছে (আম্বিয়া, ৩৪ আয়াত)। কুরআনের মতে প্রাণের উদ্ভব পানি থেকে হয়েছে (আম্বিয়া, ৩১, রুম, ৪৬ আয়াত) অন্যান্য শাস্ত্রও বলে—তম অসিত্ত মসা গূঢ় মগ্রেহ প্রবেতং সলিলং সর্বমা ইদম। (বেদ) পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল (আদি, ১।২); পানির মধ্যে প্রটোপ্লাজম নামে প্রাণবন্ত জীব

কোষগুলির উদ্ভব হয়। কুরআন বলে—মানব সত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না (দহর ২ আয়াত)। এরপর আল্লাহ্ বিভিন্ন প্রাণীর ন্যায় মানুষকেও পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন (নূহ ১৫ আয়াত)। মানুষ বর্তমান শকল-সুরত নিয়ে অন্য কোন স্থান থেকে এই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়নি। কুরআনের মতে পর্যায়ক্রমে বা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এই পৃথিবীতেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে (নূহ, ১৮ আয়াত)। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে, যেমন প্রাচীনতম জৈবিক স্তর (Archaeo Zoic) মধ্য জৈবিক স্তর (Meso Zoie) এবং নবজৈবিক স্তর (Ceno Zoic) এর মধ্য দিয়ে ক্রম বিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষ তার পূর্ণ অবয়ব লাভ করেছে। আল্লাহ্র একটি সিফত হল, রব্ব্। এর অর্থ, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করে নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে ক্রমশঃ যিনি পূর্ণতা প্রদান করেন। (মুফরাদাতে রাগেব) কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আলাক অর্থ—শোণিতের বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থা, প্রেমসহ আকর্ষণ, জোঁক জাতীয় কীট (কামুছ, মজমাউল বিহার প্রভৃতি)। প্রথম মৃত্তিকাতেই মানুষের সূত্রপাত, তারপর প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক তুচ্ছ পানিবৎ শুক্র থেকে তার বংশ ধারা ক্রমাগতভাবে প্রবহমান (সিজদা, ৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে মৃত্তিকায় অতঃপর শুক্রকীট থেকে অতঃপর রক্তপিণ্ড থেকে। (মোমিনূন, ২৮ আয়াত) অন্যত্র আছে, এই রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে তা থেকে অস্থি গজিয়েছে। এরপর অস্থির উপর মাংসের আবরণ পরান হয়েছে। (মুমিনূন, ১৬ আয়াত) এগুলিও সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় এবং এর দ্বারাও ক্রমবিবর্তনেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে (ইয়াসিন, ৩৭, যোখরুফ ১৩ আয়াত)। অর্থাৎ নিগেটিভ ও পজেটিভ এই উভয় শক্তির সংমিশ্রণেই সবকিছুর উদ্ভব। শুক্রকীট বা Sperm স্ত্রী ডিম্বকোষ বা Ova মিলিত হয়ে রক্ত পিণ্ড সৃষ্টি হয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তরিত হতে হতে মানব শিশুতে পরিণত হয়। আল্লাহ্র হুকুমেই এই সৃষ্টি। তিনি যখন বলেন 'হও' তখন তা রূপলাভ করে (নাহল, ৪১ আয়াত)। ভ্রূণের মধ্যেই প্রাণের উদ্ভব হয়। এটা অন্য কোন স্থান থেকে হঠাৎ করে মানব দেহে প্রবেশ করে না। কুরআন বলে—অতঃপর আল্লাহ্ সেটিকে (ভ্রূণকে) সঠিকভাবে সমন্বিত করে তার মধ্যে 'রূহ' ফুৎকার করেন (সেজদা, ১০ আয়াত)। প্রশ্ন উঠতে পারে এই রূহ কি? আল্লাহ্ বলেন, এটি হল তোমার প্রভুর আদেশ বা Order (বনী ইসরাঈল, ৮৬ আয়াত)। হ্যাঁ, প্রাণ একটি অর্ডারই বটে। কোন যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে আমরা যেমন বলি এটি disorder হয়ে গেছে তেমনি দেহের সঙ্গে (রূহ, আদেশ বা Order) প্রাণের বিচ্যুতিও একটি disorder। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন ডারউইনের 'বানরবাদ'কে স্বীকার করে না। ডারউইনের মতে এক বিশেষ প্রকার বানর থেকে (Lipotylu) নরের উদ্ভব। বানরের লেজ

পড়ে গিয়ে নরের সৃষ্টি হয়েছে। কুরআনের মতে মানুষকে উত্তম উপাদানে সৃষ্টি করা হয়েছে (ত্বীন, ৫ আয়াত)। The Story of Man বইতে বলা হয়েছে—His is a different brain admittedly superior in on more than degree yet in so great a degree as to constiute something virtually new in the world. (P-14) মানুষের মগজ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে, Which is incomparably superior to any other living thing (Life, 28th June, 1963) এই উপাদান অপরাপর ইতর প্রাণীর উপাদান থেকে ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব। মানুষের উপাদান সৃষ্টির সকল পর্যায়েই অন্যান্য প্রাণীর উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উন্নত ছিল। এটাই কুরআনের দাবী। প্রত্যেকটা প্রাণীই সৃষ্টির প্রথম থেকেই জাতি হিসাবে আলাদা আলাদা ছিল (প্রাণের উৎস, আইজাক আসিমভ, ১৫ পৃঃ)। আর ডারউইনের Orgin of Species এর সঙ্গে কুরআনের evolution theory এর এটাই বিরাট ও স্পষ্ট পার্থক্য। মানুষ আজ যে অবয়ব ও আকৃতি লাভ করেছে, বিভিন্ন পর্যায়ে তা এমনটি ছিল না। বিবর্তনের ধারায় দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বর্তমান পরিপূর্ণ অবস্থার উন্নয়ন। প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক ও আধ্যাত্মবিদরা ক্রমবিবর্তনবাদের প্রবক্তা ছিলেন। (বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব, ৫০ পৃঃ) উল্লেখ্য যে, মানুষ, মানব, আদমি ইত্যাদি শব্দ পরবর্তীকালে সৃষ্টি। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়গুলিতে কোন জীবেরই কোন নাম ছিল না। কারণ নামকরণ করার জন্য উপযুক্ত মানুষের তখনও আবির্ভাব ঘটে নি। বানরের লেজ খসে যাওয়ায় ঐ বানর সন্তানেরা লেজশূন্য হয়ে জন্ম নিচ্ছে এটা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় নি। এক জোড়া ইঁদুরকে লেজ কেটে দিয়ে বাচ্চা উৎপন্ন করে ঐ বাচ্চাগুলিকে ক্রমাগতভাবে কুড়িটি বংশ ধারায় (generations) লেজ কেটে উৎপাদন করে দেখা গেছে ওরা লেজ নিয়েই জন্মাচ্ছে। (Review Text in Biology) কুরআন পাঠ করলে জানা যায় যে, আল্লাহ্ জিনকে মানুষের পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন (হিজর, ২৮ আয়াত)। এই জিনেরই একজন হল পরবর্তীকালের ইবলীস (কাহাফ, ৫৬ আয়াত)। আদমকে মান্য না করে সে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল (বাকারা, ৩৫ আয়াত)। অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থই আরো বহু অস্বীকারকারী পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা। বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, আদিতে এই পৃথিবীতে উন্নত জীবকে জীন বলা হত। তারা গুহায় কন্দরে বাস করত। তাই বলা হয় জিনের আবাসস্থল 'কোহ কাহাফ' বা পর্বতগুহায়। ইংরেজীতে বলা হয় Caveman। ওরা পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি, রক্তপাত ঘটাত। বরফ যুগে এরা এশিয়া ও ইউরোপে বহুল পরিমাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যের সংস্থানে বেঁচে থাকার তাগিদে এরা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে। সাগরগুলি বরফে জমাট বাঁধা থাকায় ওরা এক গোলার্দ্ধ থেকে অপর গোলার্দ্ধে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চলে যেতে পারল। এমনিভাবে ওরা ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। তফসীরে জালালাইনে আছে ফেরেশ্‌তারা জিনদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল বিভিন্ন দ্বীপে। যারা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারল এবং উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করতে পারল তারাই টিকে গেল। আর যারা খাপ খাওয়াতে পারল না তারা ধ্বংস হয়ে

গেল। এদেরকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল আগুন। আগুনের আবিষ্কার তাদের জীবনযাত্রাকে অনেকাংশে সহজ করে দিল। একথা অসম্ভব নয় যে, ওরা আগুনের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীল ছিল বলেই এবং আগুনকে বেঁচে থাকার উপকরণরূপে গ্রহণ করেছিল বলেই বলা হয় যে, আগুন দিয়েই জিনের অস্তিত্ব বা সৃষ্টি। এটি একটি আরবী বাকধারা। যারা খেলাধূলা নিয়ে বেশী মেতে থাকে এবং ক্রীড়া প্রবণতার আতিশয্য যাদের মধ্যে বেশী তাদেরকে বলা হয় ক্রীড়ার সন্তান। তেমনি যে ব্যক্তির মধ্যে যে বস্তুর আধিক্য বেশী দেখা যায় আরবীতে তাকে সেই বস্তু থেকে সৃষ্ট বলা হয় (কশ্‌শাফুল বয়ান, জিলদ ৬, ১২৩ পৃঃ)। কোরআনেও বলা হয়েছে যে, মানুষকে ব্যস্ততা ও দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ২১:৩৮, ৩০:৫৫) অথচ ব্যস্ততা ও দুর্বলতা কোন পদার্থ নয়। নারী জাতিকে পঞ্জরাস্থি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (বোখারী) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে বক্র স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে পঞ্জরাস্থির ব্যবহার হয়েছে। (মাজমাউল বিহার ও বাহারুল মুহিত) অতএব যারা আগুনের ব্যবহার করেছিল তাদেরকে আরবী বাকধারা অনুযায়ী আগুন থেকে সৃষ্ট বলা অসম্ভব কিছু নয়। কুরআনের মতে সব প্রাণীই তো পানি থেকে সৃষ্ট। অতএব জিন নামক প্রাণীও যে পানি থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখ্য যে, জিন কোন অশরীরী জীব নয়। ইসলামে জিন ইনসের মধ্যে বিয়ে শাদীকে জায়েয করা হয়েছে (আকামুল মারজান ফি আহকামিলজান)। সাবার রাণী বিলকিসের পিতা শারাহীল মানুষ জাতি এবং মাতা মালআমা শীসান নামক জীনের কন্যা ছিলেন। (মাহেরুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭১৬ পৃঃ) বিজ্ঞান বলে এক প্রজাতির সদস্যরা অন্য প্রজাতির (লেটিনে স্পিসিস অর্থ বাহ্যিক আকৃতি) সদস্যদের সঙ্গে প্রজনন ক্রিয়া করতে পারে না। (প্রাণের উৎস, আইজাক আসিমভ, ৪৩ পৃঃ) অতএব জিন ও ইনস ভিন্ন প্রজাতি নয়। ভিন্ন প্রজাতি হলে এদের মধ্যে বিয়ে সম্ভব হত না। মানুষ সম্বন্ধে বলা হয় যে, সে খনখনে মৃত্তিকায় সৃষ্টি হয়েছে। (৫৫:১৫) কখনো বলা হয়েছে কর্দমাক্ত মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। (৭:১৩) কখনো বলা হয়েছে তোরাব বা ধূলায় রচিত হয়েছে। (১৮:৩৮) অথচ আমরা জানি যে আব, আতশ, খাক, বাত এই চার চিজে মানুষ সৃষ্টি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষও আগ বা আগুন থেকে সৃষ্ট। কিন্তু তার মধ্যে মাটির প্রতি প্রবণতা বেশী থাকায় তাদেরকে বলা হয়েছে শুধু মাটি থেকেই সৃষ্ট। এই মানুষ পদবাচ্যরাই সর্বপ্রথম মাটিকে আঁকড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা চালায়। এরাই কৃষি বিপ্লবের হোতা। পুরাতাত্ত্বিকেরা এই যুগকে নবোপলীয় যুগ বা নূতন প্রস্তর যুগ নাম দিয়েছেন। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দে এই যুগ বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় মানুষ কর্দমাক্ত মৃত্তিকায় কৃষিকার্য শুরু করে গম ইত্যাদি শস্যের চাষ করে। ফলের গাছ লাগিয়ে বাগান সৃষ্টি করে। নৃতত্ত্ববিদ মরগ্যান এই

যুগকে বর্বর যুগ বলেছেন। অনেক পণ্ডিতের মতে মেয়েরাই কৃষির প্রবক্তা। "পুরুষেরা যখন শিকারে বেরুত, মেয়েরা তখন ফলমূল এবং জংলী বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করত। এই জংলী ঘাসই আমাদের পরিচিত ধান, গম, যবের পূর্বপুরুষ" (ইতিহাসের রূপরেখা, ১৪ পৃঃ)। আল্লাহ্ জিন ও ইন্‌স এই উভয় প্রকারকেই তাঁর আবদ্ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন (জারিয়াত, ৫৭ আয়াত)। কুরআনের মতে জিনের মধ্যেও নবীর আগমন হয়েছে। (আনআম) মৌলানা মুফতি মোঃ শফী তার মারেফুল কুরআনে লিখেছেন, "এটাও অসম্ভব নয় যে, বেদের ঋষিরা জিন জাতির পয়গম্বর ছিলেন (বাংলা অনুবাদ ৩য় খণ্ড, ৫১১ পৃঃ)। কিন্তু কুরআনে বা অন্য কোথায়ও কোন জিন নবীর পরিচয় আমরা পৃথক করে পাই না। জিনদেরকে হেদায়াত করবার জন্য, আল্লাহ্‌র আবদে পরিণত করবার জন্য সুদূর অতীতে যেসব জিন নবী এসেছিলেন আমরা আজ আর তাঁদেরকে স্মরণ করতে পারছি না। কেননা, সেই ধারার সমাপ্তি হয়েছে বহু পূর্বে। আমরা যে ধারায় অবস্থান করছি সেটা ইনসান নবীর যুগ। বর্তমান ধর্মবিধানকে একমাত্র ইনসান প্রকৃতিই গ্রহণ করেছে (আহযাব, ৭৩ আয়াত)। আল্লাহ্ পাহাড়ের উপর এই বিধান নাযিল করতে চেয়েছিলেন অর্থ পাহাড়ে বসবাসকারী জিন সম্প্রদায়ও হতে পারে। কিন্তু এই শরীয়ত অগ্নি-স্বভাব বা উগ্র-স্বভাবের উপযোগী নয়। এটা আত্মসমর্পণকারী নম্র স্বভাবের উপযোগী। ঐ সময়ে মানব জাতি ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এদেরকে বলা হয় ক্ল্যান। কতগুলি ক্ল্যান নিয়ে একটি ফ্রাট্রি। কতগুলি ফ্রাট্রি নিয়ে গঠিত হত একটি ময়াটি। দুটো ময়াটি নিয়ে একটি ট্রাইব বা গোত্র। কুরআন বলে, মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পরিচয়ের জন্য। (হুজুরাত ১৪ আয়াত) আসলে সে যুগে ক্ল্যান বা ট্রাইবই ছিল এক একটি মানবগোষ্ঠীর পরিচয়ের মাধ্যম। এই আদি ক্ল্যান সমাজ পরবর্তীতে পরিবারের রূপ নেয়। এহেন সমাজ ব্যবস্থা সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে শুরু হয়েছে। ঐ যুগকে বলা হয় মৃত্তেরীয় যুগ। (ইতিহাসের রূপ রেখা ১০ পৃঃ) কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র কোন কোন দিন পঞ্চাশ হাজার বৎসর (মারীয, ৫ আয়াত)।

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের ধারণা হল, মানব জাতি এক প্রকার বানর থেকে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে Origin of species by means of natural selection এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে Descent of Man প্রকাশ করে ক্রমবিবর্তবাদের উপর নূতনভাবে আলোকপাত করেন।

বানর থেকে মানুষ হয়েছে এ কথা সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, মানব সৃষ্টি যদি ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে,

উপাদানে সৃষ্ট মানব নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকার ধারণ করেছে। মহাবিজ্ঞান আল্‌কুরআন বলে, "হাল্‌ আতা আলাল ইন্সানে হিনুম্‌ মিনাদ দাহ্‌রে লাম ইয়া কুন শাইয়াম্‌ মাযকুরা অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না" (দাহর ১ রুকূ)। অর্থাৎ—আল্লাহ্‌ মানুষকে নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দান করেছে। "কুন ফাইয়াকুম, (১১:১৭) বাক্যেও তাই বর্ণিত হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, "ওয়াকাদ খালাকাকুম আতওয়ারা, অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন" (নূহ-১)। উক্ত সূরার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "ওয়াল্লাহু আম্বাতাকুম মিনাল আরযে নাবাতান, অর্থাৎ—আল্লাহ্‌ মানবকে মাটির মধ্য থেকে নির্গত করেছেন।" এই বর্ণনাগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তা'লা বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই মাটির পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি পর্ব শুরু হয়। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ পাক বলেন, "ইন্না খালাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজিন নাবতালিহি। অর্থাৎ—মানুষকে নানা উপাদান নুৎফা বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে" (দহর)। পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃত আয়াত-গুলি মানব সৃষ্টির ক্রমবিবর্তন স্বীকার করে, কিন্তু তাই বলে কতিপয় বৈজ্ঞানিকের বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে ভ্রান্ত ধারণাকে কখনও সমর্থন করে না। কুরআনুল হাকিমের মতে, মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবীয় উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা—লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহ্‌সানী তাকভীম, অর্থাৎ মানুষকে উৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করা হয়েছে (ত্বীন)। অতএব মানুষ এবং বানরের উপাদান কখনও এক নয়। বানরের উপাদান থেকে শুধু বানরই সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি প্রত্যেক প্রাণীর উপাদানই ভিন্ন ভিন্ন। একের উপাদান দিয়ে অন্য প্রকার প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব নয়। মানুষ তার সৃষ্টি-পর্যায়ের যুগে যুগে যে রূপেই অবস্থান করুক না কেন সে সর্বাবস্থায় মানবই ছিল।

ইহুদী এবং খৃষ্টানদের বিশ্বাসে আদম হলেন সর্ব প্রথম মানুষ। পরবর্তীকালে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও এই ধারণা সংক্রামিত হয়। "কাসাসুল আম্বিয়ায়" বর্ণিত আদম-ইবলীসের গল্পটিও এই বিশ্বাসের সমর্থক। পূর্ব থেকে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত না হয়ে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমরা যদি কুরআন করীম পাঠ করি তাহলে দেখতে পাব যে, ইসলাম কখনো আদম (আঃ)-কে প্রথম মানুষ হিসাবে স্বীকার করে না কুরআনের মতে আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী এবং সভ্য মানুষের আদি পিতা। পবিত্র কুরআন বলে, "ওয়া লাকাদ খালাকনাকুম সুম্মা সাওওয়ারনাকুম সুম্মা কুলনা লিলমালাই-কাতিসজুদূলি আদামা' অর্থাৎ—আমি প্রথমে মানবজাতিকে সৃষ্টি করলাম। অতঃপর তাদেরকে

পূর্ণতা দান করলাম। তারপর ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর" (আরাফ, ২ রুকূ)। এখানে শুধু আদম সৃষ্টির কথা বলা হয়নি বরং বহুবচনে মানবজাতির সৃষ্টির পূর্ণতা লাভের উল্লেখ করে আদমকে খলীফা বা নবী হিসাবে মনোনয়ন দান করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তিনি প্রথমে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য মানবজাতিকে সৃজন করে তাদেরকে যখন দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করলেন তখন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আদমকে সৃষ্টি করলেন। এই আয়াত হতে দেখা যাচ্ছে যে, আদম প্রথম মানব নন। বরং প্রথম পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ বা মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ইচ্ছার প্রথম প্রচারক তথা প্রেরিত পুরুষ। 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরযে খলীফা" আয়াত দ্বারাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় (বাকারা, ৪ রুকূ)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে এক খলীফা বা প্রতিনিধি সৃজন করবেন। আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার অর্থ—নবুওয়ত লাভ করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য লোককে সঠিক পথে পরিচালিত করা। বর্তমান কালে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন মানব কঙ্কালের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেও পৃথিবীতে মানবজাতির বসতি ছিল। অপরদিকে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহাসিকদের মতে আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বে আদম (আঃ) এই পৃথিবীতে ছিলেন। বাইবেলের মতে আদম থেকে নূহ্‌ দশম পুরুষ এবং নূহ্‌ থেকে ইব্‌রাহীম দশম পুরুষ। অতএব আবিষ্কৃত জীবাশ্ম (Fossil)-গুলির দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সাত হাজার বৎসর পূর্বের নবী আদমের লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেও এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন শরীফে আদমের কথা কয়েক স্থানে উল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও হাওয়ার নাম কোথাও উল্লিখিত হয় হয় নি। এমনকি আদমের পঞ্জরাস্থি থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কথাও নেই, তবে নারী মাত্রকেই পঞ্জরাস্থি বা 'জেলা' থেকে তৈরী করা হয়েছে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আদমকে সৃষ্টি করে বেহেশ্‌তে রাখা হয়েছিল এমন ঘটনাও কুরআন থেকে জানা যায় না, বরং 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরযে খলীফা' বাক্য দ্বারা আদমকে এই মাটির পৃথিবীতে পয়দা করা হয়েছিল বলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন বলে, যে একবার বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে তাঁকে আর সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় না। (১৫:৪৯) অতএব মানুষ মৃত্যুর পর যে স্বর্গ লাভ করবে সেখানে আদম কখনও ছিলেন না এবং সেখান থেকে তাঁকে নির্বাসিতও করা হয়নি। আর এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবলীস ফেরেশ্‌তা ছিল না। বরং সে ছিল জিন জাতির অন্তর্গত। যথা—কানা মিনাল জিন্নি। (১৮:৫৬) ফেরেশ্‌তারা কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতে পারে না। (৬৬:৭) অতএব ফেরেশ্‌তারা বা ফিরিশ্‌তাদের সর্দার

আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে ইবলীসে পরিণত হয়েছে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা কখনো সত্য নয়।

'আদম' শব্দটি আদিম ধাতু থেকে উৎপন্ন, এর অর্থ হল, পৃথিবীর উপরিভাগ। কোন কোন মতে, আদম উদমা শব্দ থেকে উৎপন্ন, অর্থ—গন্ধমী বর্ণ। এক কথায় গুহা থেকে বের হয়ে পৃথিবীর উপরিভাগে যিনি সর্বপ্রথম সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন এবং উন্মুক্ত স্থানে বাস করার ফলে সূর্য তাপে যার দেহের বর্ণ গন্ধমী বরণ ধারণ করল তিনিই আদম নামে পরিচিত হলেন। আদমের অনুসারীগণ আদমী বা মানুষরূপে পরিচিত হল।

ইন্‌স শব্দের ধাতুগত অর্থ হল,—আকৃষ্ট হওয়া, পোষ মানা ও মিলেমিশে থাকার প্রকৃতি। ইনস্‌ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা পাক কালামে বলেছেন, "খালাকাল ইনসানামিন সালসালীন কাল ফাখ্‌খার (৫৫:১৫) অর্থাৎ ইন্‌সানকে আমি কঙ্করময় মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি।" অন্যত্র বলেছেন, "খালাকনা মিন্‌ ত্বীন, অর্থাৎ—ইনসানকে কর্দমাক্ত মৃত্তিকা থেকে সৃজন করা হয়েছে। (৭:১৩)। কোথাও বলা হয়েছে, "খালাকাকা মিন তুরাব, অর্থাৎ—শুধু মাটির দ্বারা তৈরী করা হয়েছে" (১৮:৩৮)। উক্ত আয়াতে এ-ও বলা হয়েছে যে, প্রথমতঃ মানুষকে মাটিতে সৃষ্টি করে পরবর্তী পর্যায়ে প্রজনন পদ্ধতির দ্বারা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল শেষে পূর্ণ মানুষে পরিণত করেছেন। যথা :— সুম্মা মিন নুৎফাতিন সুম্মা সাওয়াকা রাজুলা (ঐ)। কুরআন শরীফে এ-ও বলা হয়েছে যে, খুলিকাল ইনসানু মিন আজালিন, অর্থাৎ ইনসানকে ব্যস্ততা বা তাড়াতাড়ি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে" (২১ : ৩৮)। অপর এক স্থানে আছে, "খালাকাকুম মিন্‌ জুফিন, অর্থাৎ—মানুষকে দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে"। (৩০ : ৫৫) আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌তা'লা প্রাণী মাত্রকেই পানি থেকে উৎপন্ন করেছেন। আবার ঐ সকল জীবের মধ্যে কোন কোন জীবকে আগুন থেকে, গরম বাতাস থেকে, কঙ্করময় মৃত্তিকা থেকে, কর্দমাক্ত মৃত্তিকা থেকে এমনকি ব্যস্ততা এবং দুর্বলতা থেকেও সৃষ্টি করেছেন। আগুন পানি এবং সকল প্রকার মাটি পদার্থ হলেও ব্যস্ততা এবং দুর্বলতা যে কোন পদার্থ নয় সে কথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অতএব এই সব জিনিস থেকে সৃষ্টি করার প্রকৃত অর্থ কি তা আমাদেরকে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, আরবীতে যখন "খুলিকা মিনহু" বলা হয় তখন তা দ্বারা প্রকৃতি বা স্বভাবকে বুঝিয়া থাকে। বিভিন্ন তফসীরকারক বলেছেন, "কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বস্তুর আধিক্য দেখা গেল আরবের লোকেরা তাকে বলে—তুমি ঐ বিষয় থেকে সৃষ্ট হয়েছে। যেমন বলা হয়,

তুমি ক্রীড়া থেকে সৃষ্ট হয়েছ। এতে তার ক্রীড়া প্রবণতার আতিশয্যই বুঝান হয়ে থাকে" (ফত্হুল বয়ান, ৬ঃ ১২৩)। তাই আগুন, মাটি, দুর্বলতা, ব্যস্ততা, গরম বাতাস ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি করার অর্থ হল—ঐ সব সৃষ্ট প্রাণীর স্বভাবের মধ্যে উল্লেখিত বিষয়ের গুণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকা। যেমন, যাকে আগুন বা অগ্নি হাওয়া থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে তার প্রকৃতিতে আগুনের স্বভাব দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সে অত্যন্ত গরম মেজায বা অগ্নি স্বভাবের হয়ে থাকে। অপর দিকে মাটি থেকে যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে অত্যন্ত নরম প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। স্বভাব অনুযায়ী নামকরণের প্রচলন আরবে ছিল। অগ্নি স্বভাবের কারণে আবু লাহাব এবং মাটির মত ঠাণ্ডা মেজাযের জন্য আবু তোরাব বলা হত।

ইনসান, দ্বিবচন। অর্থাৎ—যার মধ্যে দু'টি উন্স বা আকর্ষণ আছে তাকে ইনসান বলে। একটি আকর্ষণ স্রষ্টার প্রতি, অপরটি সৃষ্ট জীবের প্রতি। এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে, মানুষ বা মনুষ্য মনুর বংশধরদেরকে বলা হয়। অথচ মনুর পূর্বেও যে মানব জাতি ছিল, তা সবাই স্বীকার করে থাকেন।

টাইপিষ্ট প্রয়োজন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর অফিসের জন্যে একজন সার্বক্ষণিক টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক প্রয়োজন। আহমদী প্রার্থীগণকে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করে আগামী ৩১শে মার্চ '৯৬-এর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত পাঠাতে বলা হচ্ছে। রিটায়ার্ড ধর্ম-ভীরু কর্মক্ষম প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ঃ

১। বাংলা ও ইংরেজীতে যথাক্রমে টাইপের গতি কমপক্ষে ৩০ ও ৪০ থাকতে হবে। (নির্ভুল টাইপের ক্ষেত্রে গতি কম হলেও চলবে)

২। বেতন স্কেল—৯৫০-৩০-১১০০-৫০-১৭০০ তৎসহ প্রচলিত ভাতাদি।

৩। নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, জন্মের তারিখ, জন্মগত না হলে বয়াতের তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বলিত 'বাইওডাটা' যা স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৪। দরখাস্তের সাথে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও কায়েদ/যয়ীম কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র থাকতে হবে।

বি, এ, এ, খান চৌধুরী
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(পঞ্চম কিস্তি)

তরজমা সহ আল্ কুরআনের প্রথম পারার প্রথম অর্ধাংশ

[সূরাতুল বাকারাহ্ । ইহা মদীনায় অবতীর্ণ। এতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ আছে]।

১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। [(আমি আরম্ভ করছি) আল্লাহ্র নামে (যিনি) অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়]।

২। আলিফ লাম মীম্ (আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)।

৩। যালিকা (ইহা) আল্ কিতাব (পরিপূর্ণ গ্রন্থ) লা রায়বা (নেই কোন সন্দেহ) ফীহে (এর মধ্যে) হুদাল্লিল মুত্তাকীন [মুত্তাকী (খোদা-ভীরু)-গণের জন্যে হেদায়াত (পথ-নির্দেশ]

৪। আল্লাযীনা (যারা) ইউ'মেন্ূনা [ঈমান (বিশ্বাস) আনয়ন করে] বিল গায়েবে (অদৃশ্যে) ওয়া ইউকীম্ূনা [এবং কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) করে] আস্ সালাতা [সালাত (নামায)] ওয়া মীম্মা (এবং উহা থেকে যা) রাযাকনাহুম [আমরা তাদেরকে যে রিয্ক (জীবনোপকরণ) দিয়েছি] ইউনফেকূন [তারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে]।

৫। ওয়াল্লাযীনা (আর যারা) ইউ'মেন্ূনা (ঈমান আনয়ন করে) বিমা (উহার ওপরে যা) উনযিলা [নাযিল (অবতীর্ণ) করা হয়েছে] ইলায়কা (তোমার ওপরে) ওমা (এবং যা) উনযিলা (নাযিল করা হয়েছে) মিন কাবলিকা (তোমার পূর্বে) ওয়া বিল আখেরাতে (এবং পরবর্তী কালের ওপরে) হুম ইউ'কিন্ূন (তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে)।

৬। উলায়েকা (এরাই) 'আলা (ওপরে আছে) হুদাম্মির রাব্বিহিম (তাদের প্রভুর হেদায়াতের) ওয়া উলায়েকা (এবং এরা) হুমুল মুফলিহ্ূন (তারাই সফলকামী)

৭। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ [নিশ্চয় যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে] সাওয়াউন আলায়হিম

(তাদের জন্যে সমান) আ আনযারতাহুম (যদি তাদেরকে তুমি সতর্ক কর) আম লাম তুনযিরহুম (অথবা যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক না কর) লা ইউ'মেনূন (তারা ঈমান আনবে না)।

৮। খাতামাল্লাহু (আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন) 'আলা কুলূবিহিম (তাদের হৃদয়ের ওপরে)

[টীকা (') চিহ্নদ্বারা ع ('আইন)-এর উচ্চারণ বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে]

ওয়া 'আলা সাম'ইহিম (এবং তাদের কানের ওপরে) ওয়া 'আলা আবসারিহিম (এবং তাদের চোখের ওপরে) গিশাওয়াতুন (পর্দা) ওয়া লাহুম (এবং তাদের জন্যে রয়েছে) আযাবুন আযীম (মহা শাস্তি) [প্রথম রুকূ এখানে শেষ। ع ('আঈন) দ্বারা রুকূর চিহ্ন বুঝায়—অনুবাদক)

৯। ওয়া মিনান্নাসে (আর মানুষের মধ্য থেকে) মাই'য়াকূলু (যারা বলে) আমান্না (আমরা ঈমান এনেছি) বিল্লাহে (আল্লাহ্র ওপরে) ওয়া বিল ইয়াওমেল আখেরে (এবং আখেরাতের দিনে) ওয়ামা হুম বেমু'মিনীন [যদিও তারা আদৌ মু'মেন (বিশ্বাসী) নয়]।

১০। ইউখাদি'উনাল্লাহা (তারা আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে চায়) ওয়াল্লাযীনা আমানূ (আর যারা ঈমান এনেছে) ওয়ামা ইয়াখদা'উনা [এবং (বা কিন্তু) তারা ধোঁকা দেয় না] ইল্লা আনফুসাহুম (নিজেদেরকে ব্যতীত) ওয়ামা ইয়াশ'উরূন [এবং (বা প্রকৃতপক্ষে) তারা বুঝে না]।

১১। ফী কুলূবিহিম মারাযুন (তাদের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি) ফাযাদা হুমুল্লাহু (অতঃপর আল্লাহ্ বৃদ্ধি করেছেন তাদের) মারাযান (ব্যাধিকে) ওয়ালাহুম 'আযাবুন 'আলীম (এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি) বিমা কানূ ইয়াকযিবূন (কারণ, তারা মিথ্যে বলে আসছিলো)।

১২। ওয়া ইযা কীলা লাহুম (আর যখন তাদেরকে বলা হয়) লা তুফসিদূ ফিল আরযে (পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোর না) কালূ (তারা বলে) ইন্নামা নাহনু মুসলেহূন (নিশ্চয়ই আমরা কেবল সংশোধনকারী)।

১৩। আলা ইন্নাহুম (শুনে রাখ, নিশ্চয় তারা) হুমুল মুফসেদূন (তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) ওয়া লাকিল্লা ইয়াশ'উরূন (কিন্তু তারা তা বুঝে না)।

১৪। ওয়া ইযা কীলা লাহুম (আর যখন তাদেরকে বলা হয়) আমেনূ (তোমরা ঈমান আন) কামা আমানান্নাসু (যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে) কালূ আনু'মেনু (তারা

বলে, আমরা কি ঈমান আনব ?) কামা আমানাস্ সুফাহাউ (যেভাবে নির্বোধগণ ঈমান এনেছে) আলা ইন্নাহুম (শুনে রাখ, নিশ্চয় তারা) হুমুস্ সুফাহাউ (তারাই নির্বোধ) ওয়ালাকিন্না ইআ'লামুন (কিন্তু তারা জানে না)।

১৫। ওয়া ইযা লাকু (আর যখন এসব লোক মিলিত হয়) আল্লাযীনা আমান, [(তাদের সাথে) যারা ঈমান এনেছে] কালু আমান্না (তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি) ওয়া ইযা খালাও (এবং যখন পৃথক হয় বা নিভৃতে মিলিত হয়) ইলা শায়াত্বীনিহিম (তাদের দলনেতাদের সাথে) কালু ইন্না মা'আকুম (তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি) ইন্নামা নাহনু মুসতাহ্যিউন (নিশ্চয় আমরা কেবল উপহাসকারী)।

১৬। আল্লাহু ইয়াস্তাহ্যিউবিহিম (আল্লাহ্ তাদেরকে উপহাসের শাস্তি দেবেন) ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম (এবং তাদেরকে ছেড়ে দেবেন) ফী তুগইয়ানিহিম (তাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে ইআ'মাহুন (দিশেহারাভাবে)।

১৭। উলায়েকাল্লাযীনা [এরাই (তারা) যারা] এশতারুয্ যালালাতা (ক্রয় করেছে পথভ্রষ্টতা) বিল হুদা [হেদায়াতের (সুপথের) পরিবর্তে] ফামা রাবেহাত (অতঃপর লাভজনক হয়নি) তেজারাতুহুম (তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য) ওয়ামাকানু মুহ্তাদীন (এবং তারা ছিল না বা হয় নি হেদায়াতপ্রাপ্ত)।

১৮। মাসালুহুম কামাসালে [তাদের দৃষ্টান্ত (ঐ ব্যক্তির) দৃষ্টান্তের অনুরূপ] আল্লাযীস্তাওকাদানারান (যে আগুন জ্বালালো) ফালাম্মা আযায়াত (অতঃপর যখন আলোকিত করল) মা হাওলাহু (যা এর চারিদিকে ছিলো) যাহাবাল্লাহু (আল্লাহ্ নিয়ে নিলেন) বেনূরিহিম (তাদের জ্যোতিকে) ওয়া তারাকাহুম (আর তাদেরকে ছেড়ে দিলেন) ফী যুলুমাতিন (অন্ধকার রাশির মধ্যে) লা ইউবসিরুন (তারা দেখতে পায় না)।

১৯। সুম্মুম (তারা বধির) বুকমুন (মূক) 'উমইউন (অন্ধ) ফাহুম লা ইয়ারজিউন (অতএব তারা ফিরবে না)।

২০। আও কা সাইয়্যেবিন (অথবা বৃষ্টি ধারার ন্যায়) মিনাস্ সামায়ে (মেঘ বা আকাশ থেকে) ফীহি যুলুমাতুন (এর মধ্যে রয়েছে অন্ধকাররাশি) ওয়া রা'দুন (এবং বজ্র ধ্বনি) ওয়া বারকুন (এবং বিদ্যুৎ-চমক) ইয়াজ'আলুনা (তারা করে) আসাবিআহুম (তাদের আঙ্গুল) ফী আযানিহিম (তাদের কানের মধ্যে) মিনাস্ সাওয়া'য়েকে (বজ্রধ্বনির কারণে) হাযারাল মাউত (মৃত্যু ভয়ে) ওয়াল্লাহু (এবং আল্লাহ্) মুহীতুন পরিবেষ্টনকারী) বিল কাফেরীন (কাফেরদেরকে)।

২১। ইয়াকাদুল বারকু (বিদ্যুৎ-চমক বা বিদ্যুৎ উপক্রম হয় বা নিকটবর্তী হয়) ইয়াখতাফু (কেড়ে নেবার) আবসারাহুম (তাদের চক্ষু বা দৃষ্টি-শক্তিকে) কুল্লামা (যখনই) আযায়ালাহুম (তাদের জন্যে চমকায়) মাশাও ফীহি (উহার মধ্যে চলতে থাকে) ওয়া ইযা আযলামা আলায়হিম (আর যখন তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে) কামু (তারা দাঁড়িয়ে পড়ে) ওয়া লাওশায়াল্লাহু (এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন) লা যাহাবা বে সাম'ইহিম (অবশ্যই তাদের কান বা শ্রবণ-শক্তিকে নিয়ে যেতে বা বিনষ্ট করতে) ওয়া আবসারিহিম (ও তাদের চক্ষু বা দৃষ্টি-শক্তিকে) ইন্নাল্লাহা 'আলা (নিশ্চয় আল্লাহ্ ওপরে) কুল্লে শাইঈন (সব কিছুর) কাদীর (সর্বশক্তিমান)।

(২য় রুকু শেষ)

মুক্তোঝরার বন্ধু হবে ?

শিশু-কিশোর বন্ধুরা, মাসিক আহ্বান পত্রিকায় 'মুক্তোঝরা' কি কখনো পড়েছ ? এতে তোমাদের জন্য রয়েছে ধর্মীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, পড়াশুনা, বড় মানুষের কথা, অ্যাডভেঞ্চার স্বাস্থ্যকথা, কৌশলের মজা, খেলাধূলা, ছড়া, কবিতা, কৌতুক ইত্যাদি চমকপ্রদ নানান বিভাগ। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। আর বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার, তা তো রয়েছেই।

তাই আর সময় নষ্ট না করে আজই আসরের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হও, আর তোমাদের মনের নানারকম অনুভূতির কথা জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি পাঠাও। তোমাদের লেখা ছাপাতে পারলে আমরা খুউব আনন্দিত হবো।

মুক্তোঝরার ঠিকানা—
নির্বাহী পরিচালক,
মুক্তোঝরা
৪নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা—১২১১

সংবাদ

০ ভাতগাঁ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয় গত ৯/২/৯৬ ইং রোজ শুক্রবার।

০ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে গত ২৩/২/৯৬ইং তারিখ বাদ জুমুআ ১ম বারের মত সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

০ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক রোজ শুক্রবার বিষ্ণুপুর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় আনন্দমুখর পরিবেশে মুসলেহ মাওউদ দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত পাওয়া খবরে গেছে যে, এ প্রসঙ্গে আরও সভা করেন কুমিল্লা, বগুড়া, নাসেরাবাদ, চরসিন্দুর ও ঢাকা জামাত।

০ আল্লাহ্‌তা'লার অসীম রহম ও ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনার ৪র্থ বার্ষিক তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও ১৬তম বার্ষিক ইজতেমা গত ৭/২/৯৬ হতে ৯/২/৯৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

০ খুলনা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গত ২৫/১/৯৬ইং হইতে ৩১/১/৯৬ইং পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা সপ্তাহ-১৯৯৬ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পালন করেছে।

০ খুলনা মজলিসের কয়েকজন খাদেম পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনার ১৯৯৬ সালের ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতা গত ১/১/৯৬ তাং হতে ৮/২/৯৬ তাং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

০ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ৯৬ হতে ৯ই ফেব্রুয়ারী ৬ দিন ব্যাপী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রেড়ার উদ্যোগে সপ্তম বার্ষিক তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে সুসম্পন্ন হয়।

০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে গত ৩০/২/৯৬ইং তারিখে ওয়াকারে আমল করা হয়।

০ ১০/২/৯৬ইং তারিখ বিকাল ৪ ঘটিকায় স্থানীয় মসজিদে বগুড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এবং "শান্তির জন্য শিক্ষা" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০ আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী/৯৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে নারায়ণগঞ্জ মজলিসে 'আতফাল দিবস' পালিত হয়।

০ গত ৯/২/৯৬ বৃহত্তর সিলেট জেলা মজলিসের উদ্যোগে জামালপুর মজলিসে 'আতফাল দিবস' পালিত হয়।

০ গত ১৩/১/৯৬ ইং তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের উদ্যোগে সকাল ৮ ঘটিকায় শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য ১৮০ পিচ কাপড় দলে দলে বিভক্ত হয়ে সুন্দরবন জামাতের পার্শ্বস্থ গ্রামে গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

০ গত ১৫/১/৯৬ জানুয়ারী মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের উদ্যোগে এক বিরাট ওয়াকারে আমলের আয়োজন করা হয়।

০ গত ১/২/৯৬ থেকে ৫/২/৯৬ পর্যন্ত খেদমতে খালকের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে।

দোয়ার আবেদন

আমার তৃতীয় ছেলে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ভুইঞা নৌবাহিনীতে কর্মরত আছে। গত মাসে সে সি, এম, এস এ ভর্তি হয়েছিল। তার মাথায় আঘাতের জন্য তার মাথা এবং সম্পূর্ণ শরীর চেক আপ করানো হয়েছে। বর্তমানে সে অনেকটা সুস্থ এবং কর্মস্থলে ফিরে এসেছে। সে যাতে ভালভাবে কর্মস্থলে কাজ করতে পারে তার জন্য এবং আমার স্ত্রীর বুকের এক্সরে করানো হবে। আমার মেয়ের জামাই চানপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হানিফ চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মোঃ মকবুল আহমদ চৌধুরী মেলেরিয়ার জ্বরে আক্রান্ত তাদের সকলের রোগ মুক্তির জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ শাজাহান ভুইঞা
বিষ্ণুপুর

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত তৎকালীন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোখলেছুর রহমান ভুঁইয়া গত ৫-২-৯৬ইং তারিখ বেলা ৪-৩০ ঘটিকায় ঢাকায় তাঁর ছেলের বাসায় বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। তিনি অত্যন্ত মোখলেস আহমদী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি বয়াত করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর ও সেক্রেটারী তরবীয়ত জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া তাঁর বড় ছেলে।

৬ই ফেব্রুয়ারী ভোরে তাঁর লাস নোয়াখালী নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা।

আমার পিতা মোঃ নূরুল ইসলাম চক্রবর্ত্তী গত ২৭শে জানুয়ারী '৯৬ রোজ শনিবার ৬ই রমযান সকাল ১০-১০ মিঃ হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুম ১ ছেলে, ২ মেয়ে নাতী-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মন পরিবারে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রী কাশিনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনি এতদঞ্চলের তৎকালীন একজন বড় পণ্ডিত ব্যক্তি। মরহুম মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৯৩০ সালে মরহুম আবদুল হেকিম ও মৌলানা আবদুল আযিয (ভাতুঘর)-এর তবলীগে তৎকালীন আমীর মরহুম গোলাম ছামদানী উকিল সাহেবের নিকট বয়াত করেন এবং তাঁর নাম শ্রী কালি মোহন চক্রবর্ত্তীর বদলে নূরুল ইসলাম চক্রবর্ত্তী রাখা হয়। তিনি অত্যন্ত নেক, নিষ্ঠাবান ও দোয়াগো ব্যক্তি ছিলেন। তবলীগ করা জীবনের অংশ হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে ও বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম লাভ করার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল

গত ৩রা মার্চ '৯৬ রবিবার সকাল ৭-৪৫ মিনিটে মেহীগাছা (নাটোর) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জনাব ওয়াকিল উদ্দীন (৩৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোক গমন করেন, (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তিনি একজন মোখলেস ও তাঁর পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ আজহারুল ইসলাম
পুরুলিয়া, নাটোর

মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস

আজ থেকে ১০০ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরের মহল্লা জাদীদে সুফী জান মুহাম্মদ সাহেবের বাড়ীতে প্রথম বয়াত নিয়েছিলেন যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। এ দিনটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে **মসীহ মাওউদ দিবস** নামে খ্যাত। এ দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জামাতগুলোকে সভা-সমিতি করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য নতুন প্রজন্ম ও নবাগতগণের কাছে পৌঁছানো পুরোনোদের দায়িত্ব। পরিশেষে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাতেও বলা হয়েছে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে।

আহমদী বার্তা

আসহাবে কাহাফের পাতা

আর রকীম

হুযূরের (আইঃ) প্রেরিত 'হিন্দুইজম' প্রবন্ধের

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

প্রেরিত 'হিন্দুইজম' প্রবন্ধটি পড়লাম। অত্যন্ত সঠিক মূল্যায়ণ হয়েছে প্রবন্ধটিতে। তবে 'হিন্দুইজম' এমন একটি জটিল ধর্ম যে, তাতে আস্তিকতাও আছে, নাস্তিকতাও আছে। বিপরীত মতাদর্শ নিয়ে গঠিত হয়েছে হিন্দু নামে ধর্ম। এককথায় যা কিছু হিন্দে প্রচলিত হয়েছে (ধর্ম হোক বা অধর্ম হোক) তা-ই হিন্দু ধর্ম।

পণ্ডিতেরা বলেছেন, "একটা ধর্ম কি বল। হিন্দু ধর্মে.....নানা ধর্মমতের সমাবেশ আছে (শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, ২ পৃঃ)।

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা থেকে প্রকাশিত What is Hinduism পুস্তকে বলা হয়েছে, —Hinduism does not derived from any single teacher.....but from many teachers most of whom are nameless. অপর একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে—Hinduism may be described more as anti-religion than as religion. It has no revealed book in the sense other religions have ....Hinduism, therfore, has no Messiah, no book and no church. Hence it is apt to say that Hinduism is a leaderless, churchless and bookless religion (Is Hinduism a religion? The Illustrated weekly of India, Vol. C111, 45, Dec, 19-25, 1982, P-29)

বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম নামে কোন ধর্ম নেই। সিন্ধু নদের তীরে যারা বাস করত তাদেরকে পারশ্যবাসীরা হিন্দু বলত। প্রাচীন পার্শী ভাষায় 'শিন' স্থলে 'হে' ব্যবহৃত হয়।

মূর্তি পূজা গ্রীকদের কাছ থেকেই ভারতে এসেছে। এর আগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন, "It is an interesting thought that image

worship came to India from Greece. The vedic religion was opposed to all forms of idol and image worship. There were not even any tempels for the gods (The Discovery of India, Page 172) স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ভারতে প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্রে মিলিত হয়েছে (ভারতে বিবেকানন্দ ২৮৬ পৃ:)। প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, Brahmins do not worship idols (Crowford's History of the Indian Archipelago, Vol. I, III, IV)। যজু বেদে আছে,—পরমেশ্বরের কোন তুলনা হয় না (৩২/৩ মন্ত্র)। উপনিষদে আছে তাঁর সমান বা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই (শ্বেতাশ্বতর, ৬/৮)। এ ব্যাপারে বহু বর্ণনা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে।

দেব বা দেবতা অর্থ আলো। ইন্দ্র অর্থ যে বৃষ্টি বর্ষণ করে। এমনি দেবতারা হল, কেউ নদী, কেউ সূর্য, কেউ অগ্নি ইত্যাদি (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ৭৯১, ৮০০ পৃ:) পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদে যারা বিশ্বাস করে তারা বলে মানুষের আত্মার কোন স্রষ্টা নেই (মরণের পরে, ১৮ পৃ: স্বামী অভেদানন্দ)। অথচ বৈদিক সংহিতায় জন্মান্তরবাদ নেই। তবে গীতা বলে, পুরাতন বস্ত্র পরিবর্তন করে মানুষ যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি মানুষ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ ধারণ করে (সাংখ্যযোগ)। কোথাও বলা হয়েছে, "যত দিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন নরকে থাকবে" (গুরু গীতা, ৭৫ পৃ:)। মোক্ষ লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কারো কারো মতে চক্রাকারে জন্ম হয়। অবতাররাও পশু এমন কি শূকররূপে (বরাহ অবতার) আগমন করেন। কেউ কেউ কৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি অতি মানুষ ছিলেন না (বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড)। যোগ (yoga) অর্থ সম্পর্ক স্থাপন। একটির সঙ্গে অপরটি যুক্ত করা। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনই যোগের উদ্দেশ্য।

[হুযূর (আই:) সাম্প্রতিক তাঁর এক পত্রে আমার এই পর্যালোচনার (ইংরাজীতে প্রেরিত) অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। হুযূরের (আই:) ন্যায় বিরাট হৃদয়ের অধিকারীর পক্ষেই এহেন প্রশংসাপত্র প্রদান করা সম্ভব]।

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা আমাদের ইমামের কথায় যত সক্রিয় হবো ততই আমরা আমাদের দেশবাসীকে অবক্ষয়ের পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবো। বর্তমান সংকটের মুহূর্তেও দেশ আমাদের নিকট বিশেষ দোয়ার প্রত্যাশী। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশ বাঁচলে দেশের লোক বাঁচবে। ইলাহী জামাতের সদস্য হিসেবে তাই আসুন আমরা আজ এক্ষণি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হই এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে জন্মভূমির সুসন্তানদের মত তার সেবা করে ধন্য হই।

সম্পাদকীয়

১লা চৈত্র, ১৪০২ বাং, ১৫ই মার্চ, ১৯৯৬ ইং

দেশ-প্রেম

প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমির প্রতি প্রত্যেকেরই একটা নাড়ির টান থাকে—গভীর অরণ্য, সাগর বক্ষঃ, উষর মরু, পর্বত-বন্দর, শস্য-শ্যামল ভূমি—যেখানেই তার জন্ম হোক না কেন। প্রকৃতির সংস লীলা ক্ষেত্র বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই সোনার বাংলায় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। এর স্বচ্ছ নীল আকাশ, স্নিগ্ধ জ্যোস্নার বিরণ, মৃদুমন্দ সমীরণ, সবুজ শ্যামল ধান ক্ষেত, অসংখ্য নদী-খাল-বিল, কোকিল ডাকা বসন্ত—এই বিচিত্র পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে আমরা বড় হয়েছি। আমরা এই সোনার দেশকে ভালবাসি, ভালবাসি এর প্রতিটি মানুষকে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি জন্মভূমিকে ভালবাসার কথা। তিনি বলেছেন, "হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" অর্থাৎ জন্মভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গীভূত। তিনি (সাঃ) তাঁর দেশকে কত ভালবাসতেন তা আমরা তাঁর হিজরতের সময়ের ঘটনা থেকে জানতে পারি।

দেশকে ভালবাসি বললেই কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায় না। দেশকে ভালবাসতে হলে একদিকে যেমন সুনাগরিক হতে হয় তেমনি দেশের প্রয়োজনের সময়ে এর পাশে নিজের যা কিছু আছে তা নিয়ে দাঁড়াতে হয়। আজ আমাদের এই বাংলাদেশে সবচে' বড় যে অভাব তা হ'ল সুস্থ নৈতিকতার অভাব, মানুষকে ভালবাসার অভাব। নিচু তলা থেকে শুরু করে ওপর তলা পর্যন্ত সকল স্তরে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে নৈতিক অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের প্লাবনে যেন গোটা জাতি আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই প্রতিদিন সংবাদ পত্রে চোখ বুলালেই। গভীরভাবে পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এই অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে খোদা-বিমুখতা। ন্যায়-নীতিকে পদদলিত করে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মত জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। জড়বাদিতা জগদ্দল পাথরের মত এ সমাজের বুক চেপে বসেছে। কেবল নিজের আরাম আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই সকলে ব্যস্ত। তা যে কোন মূল্যেই অর্জন করতে হবে। এতে সমাজের তথা দেশের ক্ষয়-ক্ষতির কোন পরওয়াই করা হয় না।

এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে ইলাহী জামাতের লোকদের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী। জন্মভূমির মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করতে না পারলে এ অবক্ষয়ের স্রোত সবলকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নিজ গরজেও তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আর এ কাজ সম্ভব হতে পারে দু'টি পদ্ধতিতে—প্রথমতঃ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ অর্থাৎ মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করে, দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্যে খোদার দরবারে কাতর প্রার্থনা করে। আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) পূর্বাহ্নেই আমাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেছেন এবং বার বার তাগিদ দিচ্ছেন যেন আমরা প্রত্যেকে

(অবশিষ্টাংশ ৫২-এর পাতায় দেখুন)

১৭শ সংখ্যা
Fortnightly THE AHMADI
১৫ই মার্চ, ১৯৯৬
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। প্রতি শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272